শেষ বসন্ত

এই বসন্তই কি পৃথিবীর শেষ বসন্ত ?

জ্যোতির্বিদেরা ঘোষণা করেছেন এই বসন্তেরই শেষ হওয়ায় পৃথিবীর ওপর নেমে আসবে ধ্বংসের কাল যবনিকা। রাজমোহিনী কলেজের নবাগতা ছাত্রী বাসন্তী মিত্রকে এ খবর বিচলিত করে না। গত চার বছব ধবে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অশোক কাঞ্জিলালেরও এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই, সে দামী রেসিং কার নিজেই ড্রাইভ কবে কলেজে আসে, কলেজ ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি কবে আর দুহাতে টাকা ওড়ায়। মঞ্জরীকে সে প্রত্যাখ্যান কবেছে কিন্তু ভুলতে পারেনি, তাই বাসন্তীর আবেদন তার কাছে ব্যর্থ। দর্শন-অধ্যাপক অনিমেব রায়ের পত্নী হিমানীকে দেখে চীফ এঞ্জিনীয়াব শঙ্কর দত্ত প্রথম অনুভব কবলেন জীবনে তিনি কি' হারিয়েছেন।...

পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংসে দার্শনিক অনিমেষ দেখলেন শয়তান-কবলিত পৃথিবীব মুক্তির একমাত্র উপায়, তবু মানুষের এতদিনের সাধনায় গড়ে তোলা সভ্যতা—সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সব কিছুই পৃথিবীব সঙ্গে ধ্বংস হযে যাবে ভেবে অসীম বেদনায় ভরে উঠল তাব মন।...

এলো দুর্যোগেব রাত। বেড়েই চলেছে দুর্যোগ। হযতো আজ রাতেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রাণপণে ছুটলেন অনিমেষ রায়। মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে একবার, শুধু একবার তিনি দেখে নিতে চান...

অজিত কৃষ্ণ বসু

ব্যঙ্গ ও কৌতুক রস পরিবেশন করে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন অজিত কৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব) তাঁদের অন্যতম। কেবল কবি নন, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধকার হিসাবেও সমান যশের অধিকারী ইনি। বাংলা ও ইংরাজি দুই ভাষাতেই এঁর কলম সমান চলে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে অজিত কৃষ্ণ বসুর জন্ম হয়। এঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত ঢাকা জেলায়। পিতা শৈলেন্দ্রমোহন বসু সাহিত্যরসিক এবং বিভিন্ন ভাষাবিদ্। অজিত কৃষ্ণ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা আরম্ভ করে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. এবং কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পত্রিকাতেই এঁর সাহিত্যকর্মের হাতেখড়ি এবং সেই থেকেই লিখে চলেছেন বহু পত্র-পত্রিকায় বাংলা এবং ইংরাজিতে, বড়দের এবং ছোটদের জন্যে। বর্তমানে ইনি কলকাতার আশুতোষ কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

যাদু-কাহিনী	বিচিত্র-কাহিনী
প্রজ্ঞাপারমিতা	উপন্যাস
বাতাসী বিবি	”
বিধাতা	”
সানাই	”
শকুন্তলা স্যানাটোরিয়াম	”
পাগলা গারদের কবিতা	কবিতা
নে-তে-তেরি-তোম	”
এক নদী বহু তরঙ্গ	”
খামখেয়ালী ছড়া	”
প্রফেসার হেঁদারামের ডায়েরী	কিশোর সাহিত
নতুন দিগন্ত	অনুবাদ
শহরতলির শয়তান	”

[বারট্রাণ্ড রাসেল-এর গল্পসংগ্রহ]

শেষ বসন্ত

অজিত কৃষ্ণ বসু
[অ কৃ ব]
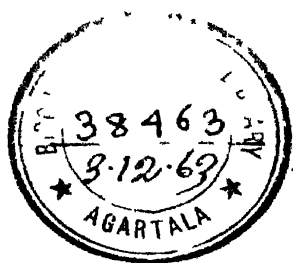
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা - ১২
১৩৭০

প্রথম সংস্করণ ঃ দু হাজার
ভাদ্র ১৩৭০ । সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশক ঃ ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা - ১২

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ নিতাই মল্লিক

মুদ্রক ঃ দ্বিজেন বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিমিটে
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৯

দাম ঃ চার টাকা

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে . . .'

ভোরবেলা। বেতারে বাজছিল রবীন্দ্র-সংগীত। ভেসে আসছিল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের কানে। রাজমোহিনী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

সে গান শুনে উদাস হয়ে উঠল অনিমেষ রায়ের মন। বসন্ত বেশ কিছু দিন থেকেই জাগ্রত দ্বারে। বেশ কিছু দিন হল গাছে গাছে জেগেছে নতুন পাতা, থরে থরে ফুটেছে বসন্তের ফুল, অনেক কোকিলের গানও শুনেছেন অনিমেষ রায়। তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে যেখানে থাকেন, সেখানে বসন্তঋতু এলে টের পেয়ে যাওয়ার মত প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে।

'হ্যাঁ, বসন্ত জাগ্রত। পৃথিবীর শেষ বসন্ত,' ভাবলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। বসন্তের এই প্রভাতে বসন্তেরই গান পরিবেশন করছে কলকাতার বেতার ; তাকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি করুণচিত্তে।

পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, এই বাণী দিয়েছেন পৃথিবীর কয়েকজন সেরা জ্যোতির্বিদ। আভাস দিয়েছেন এই বসন্তঋতুর শেষ হপ্তায় ধ্বংস হবে পৃথিবী। এসেছে সেই শেষ হপ্তা। শুধু সঠিক তারিখ সম্পর্কেই যা-একটু মতভেদ ; ধ্বংস যে হবে পৃথিবী, এ বিষয়ে সবাই প্রায় একমত। অনিমেষ রায়ও মনে মনে ভাবছেন এত দিন পর এবার আর পৃথিবীর রক্ষা নেই, তাকে ধ্বংস হতে হবেই।

পৃথিরী ধ্বংস হবে, এমনি ভবিষ্যদ্বাণী আগেও ঘোষিত হয়েছে কয়েকবার ; পৃথিবী ধ্বংস হয় নি। কিন্তু এবার পালে বাঘ পড়বেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই অনিমেষ রায়ের। তিনি নিশ্চিত অনুভব করেছেন পৃথিবীর এবার আর রক্ষা নেই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে

মহাশূন্যে যতগুলো গ্রহ এক সরলরেখায় পড়েছিল, এ বছর পড়েছে তার চাইতে বেশি। এই এতগুলি গ্রহের একত্র সমাবেশের ফলে যে প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তার ধাক্কা সামলাতে পারবে না পৃথিবী।

আজ রবিবার নয়, অন্য কোনো সাধারণ ছুটির দিনও নয়। সব অফিস খোলা, অন্যান্য বিদ্যায়তনগুলিও সব খোলা, বন্ধ শুধু 'রাজমোহিনী কলেজ'। আজ প্রতিষ্ঠাতার স্বর্গীয়া সহধর্মিণী রাজমোহিনী দেবীর মহাপ্রয়াণের তারিখ। সত্যিকারের ছুটি অনুভব করছেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়, কারণ তাঁর ছুটি আজ সম্পূর্ণ একক, অদ্বিতীয়, অন্য অনেকের ছুটির ভিড়ে তাঁর ছুটি আজ হারিয়ে যায়নি। অবশ্য তাঁর কলেজের অধ্যাপকের আর ছাত্রছাত্রীদেরও আজ ছুটি —রাজমোহিনী কলেজ কো-এডুকেশন-পন্থী—কিন্তু এ পাড়ায় তাদের কেউ নেই, তারা সবাই অনিমেষ রায়ের দৃষ্টির বাইরে।

এ পাড়ায় কেরানী, কর্মচারী প্রভৃতি যাঁরা আছেন, তাঁরা অনেকেই ইতিমধ্যে কর্মস্থল অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন, কেউ কেউ রওনা হবার তোড়জোড় করছেন। অনিমেষ রায়ের বাড়ির পাশ দিয়েই তাঁদের অনেকের বাস ধরতে যাবার রাস্তা। তাঁদের অনেককে যেতে দেখলেনও অনিমেষ রায়, আর তাঁদের অফিস-যাত্রার সঙ্গে নিজের ঘরে বসে ছুটি উপভোগ তুলনা করে একটু পুলক অনুভব করলেন। আর ভাবলেন, 'কী স্বার্থপর আমি!' তারপর সঙ্গে সঙ্গেই ভাবলেন, 'ভুল ভাবলাম হয়তো। রুটিন-মাফিক অফিস যাওয়াতেই বোধহয় এদের আনন্দ। ছুটির দিনের ফাঁকা আবহাওয়ায় এঁরা হয়তো হাঁপিয়ে ওঠেন।'

বসন্ত যতই জাগ্রত হক, কোকিল কুহু কুহু করে যতই গলা ভাঙুক, গাছে গাছে বসন্তের ফুল যতই ফুটুক, এই নিয়মিত অফিস, দোকান আর কারখানা-যাত্রীদের সে দিকে বড়-একটা নজর নেই। এঁদের

কাছে সব ঋতুই সমান, মুড়ি-মিছরির এক দর, কেবল বর্ষাঋতু বাদে। বর্ষাঋতুটা একটু আলাদা, বেয়াড়া রকমের আলাদা, কারণ বর্ষায় রাস্তায় ঘন ঘন জল জমে, কাজের জায়গায় ঠিকমত হাজিরা দিতে খুবই অসুবিধা হয়।

বাস্তার ধারে বেশ শৌখীন ডিজাইনেব রেলিং, রেলিং-এর মাঝখানে গেট, আর এ ধাবে সরু তু ফালি জায়গায় কিছু ফুলের গাছে নানা রঙেব ফুল ফুটে আছে ; এই হল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের বাগান। বাগানেব এ ধারে একফালি বারান্দা, তারি একধারে একখানা টেবিল আর খানকয়েক চেয়াব। তারি একটিতে বসে চা খাচ্ছিলেন আর খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলোচ্ছিলেন অনিমেষ রায়। আরেকটি চেয়াবে বসে একটা সচিত্র গল্পেব বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল তাঁর দশ বছরেব মেয়ে রীতা। তার ইস্কুল আজ ছুটি নয়, কিন্তু আজ তাকে স্কুলে যেতে দেন নি অনিমেষ, তাঁর ইচ্ছে হয়েছে আজ তাঁব এই ছুটির মত ছুটির দিনে মেয়ে তাঁর সঙ্গে বাড়িতেই থাকুক। স্কুল না যেতে আপত্তি কবেনি রীতা, আজ একটু রুটিন ভাঙার আনন্দ তাব ভালই লাগছে। মেয়ের পাশের চেয়ারে বসে অনিমেষ-পত্নী হিমানী।

'কি মশাই অনিমেষবাবু ?' রাস্তা থেকে হাঁক ভেসে এল অফিস-যাত্রী নারাণবাবুর। 'এত বেলায় চা খাচ্ছেন, কালেজ নেই বুঝি ?'

কলেজ নয়, কালেজ উচ্চারণ কবেন নারাণবাবু, এই আকার-সম্বলিত উচ্চারণটাই তাঁর পছন্দ।

'আজ্ঞে না।'

'সেকি মশায় ? আজ আবার ছুটি কিসের ?'

'আজ রাজমোহিনী দেবীব তিরোধান-দিবস। আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতার সহধর্মিণী রাজমোহিনী দেবী,' বললেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'ওঁরই স্মৃতিতে কলেজ কিনা।'

রাস্তায় নারাণবাবুর হাসি শোনা গেল, আর হাসির পরে—'আজ অমুকের তিরোধান, কাল অমুকের আবির্ভাব, পরশু অমুকের অন্নপ্রাশন, তরশু অমুকের আক্কেল-দাঁত ওঠাব বার্ষিকী—তাব ওপর গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি। আছেন ভাল। এবার মবলে যেন প্রোফেসর হয়ে জন্মাই।'

আগামী জন্মে অধ্যাপক হবার কামনা বুকে নিয়ে বাস ধরতে চলে গেলেন কেরানী নারাণবাবু। অফিসে হাজিবা দিতে এ মাসে ইতিমধ্যেই দু দিন দেরি হয়ে গেছে। তৃতীয়বাব দেবি হলে আব লজ্জার সীমা থাকবে না ; এ তো আব প্রোফেসারি নয় যে, দেরি করে ক্লাসে গেলেও কিছু যাবে আসবে না, ববং ছাত্রবা খুশিই হবে।

'এবার মলে!' ভাবলেন অনিমেষ রায়। 'তাহলে এবাব মববার কথাটা মাথায় ঢুকেছে ? কিন্তু শুধু আপনি নন, নাবাণবাবু। পৃথিবী-সুদ্ধু সবাইকেই যে এবাব মবতে হবে। আব প্রোফেসব হয়ে জন্মাবার জায়গাই বা কোথায় পাবেন আপনি ? গোটা পৃথিবীই যে এবাব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ভাবতে ভাবতে কেরানী নাবাণবাবুব নিশ্চিন্ত বোকামিব কথা চিন্তা করে মনে মনে হাসতে গিয়ে বাইবেও একটু হেসে উঠলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

'কি হলো ?' স্বামীকে শুধালেন শ্রীমতী হিমানী বায়।

কিছুদিন ধরেই স্বামীকে যেন একটু উদাস, অবসন্ন, নিরুৎসাহ দেখছিলেন হিমানী রায়। বরাববই একটু খাপছাড়া ধরনের মানুষ অনিমেষ, কিন্তু কিছু দিন ধরে তাঁর খাপছাড়ামিব মাত্রাটা যেন একটু বেশি।

'কার ?' শুধালেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

হিমানী রায় বললেন, 'তোমার।'

'কিছু নয়। কেন বলো তো ?'

'হঠাৎ হেসে উঠলে কিনা, তাই।'

'হেসে উঠলাম, এবার মরলে নারাণবাবু প্রফেসর হয়ে জন্মাবেন শুনে,' বললেন অনিমেষ রায়।

'কেন, এমন ইচ্ছে কি হতে নেই?' শুধালেন হিমানী রায়।

'ইচ্ছে যা খুশি হতে পারে। কিন্তু এবার মরলে নারাণবাবু আবার জন্মাবেন কোথায়?'

'কেন, এই পৃথিবীতে। এই বাংলাদেশেই হয়তো।'

অনিমেষ রায় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'পৃথিবীই যে আর থাকছে না, হিমানী।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে,' বললেন অনিমেষ রায়। 'এবার একেবারে সম্পূর্ণ বিলোপ, যাকে বলে কম্‌প্লিট অ্যানাইহিলেশ্যন।'

হিমানী রায় বললেন, 'শেষকালে তুমিও ঐসব সৃষ্টিছাড়া কথায় কান দিতে শুরু করলে?'

কান তো বটেই, মনও বেশ ভাল করেই দিয়েছিলেন অনিমেষ রায়, শুধু সে কথা জানতে দেননি হিমানীকে। আজ কথাটা হঠাৎ কেমন করে বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

একটু যখন বলে ফেলা হয়েছে, তখন খোলাখুলি সবটুকু বলে ফেলাই ভাল হবে ভেবে অনিমেষ রায় বললেন, 'এবারকার মত এতগুলো গ্রহের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নি। এর অনিবার্য ফল, পৃথিবী ধ্বংস। এবার আর সাধারণ প্রলয় নয়, মহাপ্রলয়।'

'প্রলয়' হবে শুনে খুশি হয়ে রীতা বলে উঠল, 'প্রলয় হবে, বাবা? খুব মজা হবে তাহলে। আমি কখনো প্রলয় দেখি নি। কিন্তু সেই প্রলয়-পয়োধির স্তোত্রটা জানি,' বলে কবি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র থেকে সুর করে আবৃত্তি করল ঃ

'প্রলয়-পযোধিজলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্,
কেশব-ধৃত মীন শরীব,
জয় জগদীশ হরে।'

স্কুলে গানেব ক্লাসে এই স্তোত্র গাইতে শিখেছে রীতা। গান শেখাবার দিদিমণি মানেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই মানেটা খুব ভাল লেগেছিল রীতার। সারা পৃথিবী ডুবে গেছে প্রলয়ের বন্যায়; পাছে বেদের মত অমূল্য গ্রন্থ প্রলয়বন্যাব জলে ডুবে নষ্ট হয়ে যায়, সেইজন্য স্বয়ং বিষ্ণু সেই বন্যাব জলে মাছ-রূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজের পিঠের ওপর বেদ ধারণ করেছিলেন।

'বিষ্ণু মাছের দেহ ধাবণ কবে বেদকে না বাঁচালে, বেদ জলে ডুবে পচে নষ্ট হয়ে যেত,' বলল বীতা। 'বেদ খুব দামী বই, খুব ভাল বই। না, বাবা ?'

অধ্যাপক অনিমেষ বায় বললেন, 'হ্যাঁ মা, ওতে এমন সব জ্ঞানেব কথা আছে, সারা পৃথিবীতে যার তুলনা নেই। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলার বলেছেন—কিন্তু সেসব শক্ত কথা তুমি এখন বুঝবে না। যখন বড় হবে, তখন--'

নিজের ভুল খেয়াল করে থেমে গেলেন অধ্যাপক অনিমেষ বায়। এই বসন্তেই তো পৃথিবীর শেষ। ম্যাক্স্‌মূলার বেদ সম্বন্ধে কী বলেছেন, তা কোনো দিনই জানা হবে না রীতাব।

'এবারকার প্রলয়েও কি তেমনি বন্যা হবে, বাবা, যাতে বিষ্ণু মাছ হয়ে পিঠের ওপর বেদ ধরে রেখেছিলেন ?' প্রশ্ন করল রীতা। তারপর বলল, 'জানো বাবা, মাছ খাবার সময় আমার মাঝে মাঝে খুব বিষ্ণুর কথা মনে হয়। আর ওঁর পিঠের ওপব বেদ ধারণ করাটা বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। এবার আমায় দেখাবে, বাবা ?'

'কিন্তু পৃথিবীই যে ধ্বংস হয়ে যাবে, রীতা,' বললেন অনিমেষ রায়।

রীতা বলল, 'তা হক গে। তার আগে আমি বিষ্ণুর মাছ হওয়া দেখব। খুব বড় মাছ, না বাবা? তিমি মাছের মত? না, আরো বড়?'

হিমানী বললেন, 'তা তোর বাবা কি করে জানবেন, বোকা মেয়ে? উনি কি আর সেই অবতারের সময় জন্মেছিলেন?'

'তাহলে তুমি তখন কোথায় ছিলে বাবা?' শুধাল রীতা।

অনিমেষ রায় বললেন, 'তখন ছিলাম ভবিষ্যতের গহ্বরে।'

'সেটা কোথায়, বাবা?' শুধাল রীতা। অমন অদ্ভুত জায়গার নামও সে শোনে নি কখনো।

'ও তুমি পরে বুঝতে পারবে, রীতা,' বললেন অনিমেষ রায়। তারপর 'কোনো দিনই বুঝবে না।'—ছলছল চোখে বললেন মনে মনে।

'পৃথিবীটা এবার কি রকম করে ধ্বংস হবে বাবা?' শুধাল রীতা।

এই-সম্পর্কীয় আলোচনাই খবরের কাগজে পড়ছিলেন অনিমেষ রায়,—বহু-গ্রহ-সম্মেলনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে অনেকগুলি চিঠি, আর দুটি প্রবন্ধ। সেগুলো পড়ে অনিমেষ রায় দেখলেন কেউ বলছেন কিচ্ছুই হবে না, কেউ বলছেন সামান্য কিছু হবে, কেউ বলছেন কোনো কোনো জায়গায় ভীষণ ব্যাপার হবে, কেউ বলছেন পৃথিবীর সর্বত্রই ভীষণ ব্যাপার ঘটবে। কেউ বলছেন পৃথিবীর বুক থেকে জীবন নির্মূল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু পৃথিবী থাকবে। কেউ বলছেন পৃথিবীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই শেষোক্ত মত যাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে একমত অনিমেষ রায়।

দশ বছরের মেয়েটাকে এইসব ভয়ংকর কথা বলা উচিত হবে কি-না সেটা একটুক্ষণ বিবেচনা করে দেখলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। তারপর ভাবলেন ভয়ংকরের সম্মুখীন হতে যখন হবেই রীতাকে, সে দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে বলে সর্বাত্মক এই চরম ধ্বংসলীলা তাকে যখন রেহাই দেবে না, তখন আগে থেকেই তার মনটাকে তৈরি করে

রাখাই তো ভাল, তাতে রুদ্রের আবির্ভাবটা তার কাছে অত দুঃসহ হবে না।

বললেন, 'ফুলে ফুলে উঠবে সমুদ্রের, হ্রদের, নদীর, দীঘির জল, পৃথিবীর সব ডাঙা তলিয়ে যাবে জলের তলায়। ভূমিকম্পে ভূমিকম্পে সারা পৃথিবীর বুক-পিঠ একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। আর, পৃথিবীর ভেতরে ভীষণ আগুন চব্বিশ ঘণ্টা দাউ দাউ করে জ্বলছে, জানো তো?'

রীতা বলল, 'জানি, বাবা।'

'আগ্নেয়গিরির কথা জানো?'

'ভূগোলে পড়েছি। আগুনের পাহাড়গুলোর মুখ থেকে তুবড়ি-বাজির মত আগুনের ফোয়ারা বেরোয়।'

'হ্যাঁ, পৃথিবীর ভেতরকার আগুন যখন অস্থির হয়ে ওঠে, যখন সে আর পাতালের অন্ধকারে পড়ে থাকতে চায় না, ভীমবেগে বেরিয়ে পড়বার রাস্তা খোঁজে। তখনি হয় আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত। এবার ভেতরেব আগুন একেবারে ক্ষ্যাপার মত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এবাব শুধু আগ্নেয়গিরি নয়, এবার যে-কোনো জায়গায় মাটি ভেদ করে আগুনের ফোয়ারা উঠতে পারে।'

রীতা বলল, 'তাহলে তো ভাবি মজা হবে, বাবা। ঐ মাঠের মাঝখানে যদি মাটির তলা থেকে ভুস্ করে আগুনের তুবড়ি শুরু হয়, তাহলে বেশ এইখানে বসে বসে দেখা যাবে।'

'আর, পৃথিবীব ভেতরের সবগুলো আগুন যদি একসঙ্গে ক্ষেপে উঠে একসঙ্গে সব দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই একটা বিরাট বোমার মত ফেটে চারধারের মহাশূন্যে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, আর কোনো দিন তার পাত্তাই মিলবে না, কোনো চিহ্নই থাকবে না যে, পৃথিবী বলে একটা জায়গা ছিল, তাতে মানুষ বলে এক জাতের প্রাণী ছিল।'

বসন্তের এই ভোরবেলায় পৃথিবী-ধ্বংসের আলোচনা আর ভাল লাগছিল না হিমানী রায়ের। অবশ্য তিনি জানতেন পৃথিবী চিরতরে ধ্বংস হবার আশু কোনো সম্ভাবনা নেই, এই হুজুগ-জাগানিয়া জ্যোতির্বিদের দল যাই বলুন না কেন। কিন্তু তাঁর মনে হল দশ বছরের মেয়েটার মাথায় এসব বাজে কথা না ঢোকানই হয়তো ভাল। আপনভোলা অধ্যাপক স্বামীর কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের প্রমাণ হিমানী অনেক পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনে হল আজ আরেকটু বাড়তে দিলে অনিমেষ রায় মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাবেন। কিভাবে স্বামীকে থামানো যাবে ভাবছেন, এমন সময় রীতা বলল, 'পৃথিবীটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলে খুব ভাল হয়, বাবা। আর ইস্কুলে যেতে হবে না।'

'তোমার কি ইস্কুলে খুব খারাপ লাগে, রীতা?' শুধালেন অনিমেষ রায়।

রীতা বলল, 'না বাবা, ইস্কুল আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু ইস্কুলের বাসে অত আগে বাড়ি থেকে বেরোন আর অতক্ষণ বাসে বসে অত দেরিতে বাড়িতে ফেরা বড্ড খারাপ লাগে। ললিতার বেশ আরাম। নিজের গাড়িতে ইস্কুলে আসে, নিজের গাড়িতে বাড়ি ফেরে। বাসের জ্বালাতন ওকে একদম সইতে হয় না।'

হিমানী মেয়েকে ধমকে বললেন, 'ললিতার সঙ্গে টক্কর দিতে যেয়ো না, রীতা। ওর বাবা হলেন মস্ত কারখানার চীফ এঞ্জিনীয়ার।'

নিজের কথাটা ভেবে দেখলেন অনিমেষ রায়। সত্যিই তিনি স্ত্রীকে আর কন্যাকে খুব সচ্ছলতার স্বাদ দিতে পারেন নি। মোটামুটি রকমের খাওয়া-পরার অভাব অবশ্য কোনো দিনই হয় নি, কিন্তু ঠিক ঐটুকুই, তার বেশি কিছু নয়। হিমানীর বাবা অমর চৌধুরী কলকাতার একজন নামকরা অডিটর, বেশ পয়সাওয়ালা লোক। তিনি জামাতা হিসাবে পছন্দ করেন নি অনিমেষকে, অনিমেষকে

নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন হিমানী। হিমানীর বাবার এ বিয়েতে আগ্রহ ছিল না মোটেই—অনিমেষের চাইতে জীবনে অনেক বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের হাতে হিমানীকে তিনি সম্প্রদান করতে চেয়েছিলেন, এবং পারতেন—কিন্তু কন্যার স্বয়ম্বরা হবার অধিকারে তিনি হস্তক্ষেপও করতে চান নি। শুধু বলেছিলেন, 'অনিমেষ ভাল ছেলে তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তুমি যে হালে অভ্যস্ত হয়ে বড় হয়ে উঠেছ, সে হালে তোমাকে অনিমেষ কোনো দিন রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি না। দারিদ্র্যের জীবন যদি বরণ করে নিতে চাও তো বরমাল্য পরাতে পারো অনিমেষের গলায়, কিন্তু পরে যদি পস্তাতে হয় তখন নিজেকেই শুধু দায়ী কোরো, তখন মনে কোরো আমার এই সাবধানবাণীর কথা।'

এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও সামান্য মাইনের অধ্যাপকের গলায় বরমাল্য পরিয়ে কুমারী হিমানী চৌধুরী হয়েছিলেন শ্রীমতী হিমানী রায়। সে কথা আজ মনে পড়ে গেল অনিমেষ রায়ের। তিনি কি ভুল বা অন্যায় করেছিলেন হিমানীর বরমাল্য গলায় পরে তাঁর নিজের দারিদ্র্যের ভেতর হিমানীকে টেনে এনে? কিন্তু না, তিনি তো টেনে আনেন নি, বা ভুল আশা দিয়ে ভুলিয়ে আনেন নি হিমানীকে। তবে কি আজ এত দিন পরে হিমানীর মনে আফসোস হচ্ছে পয়সাওয়ালা স্বামীর স্ত্রী নন বলে? হিমানীর কি এটা ক্ষোভের কারণ হয়েছে যে, রীতার বাবা ললিতার বাবার মত মোটা মাইনের কর্মচারী নন, এবং মোটরগাড়ি রাখবার আর্থিক সামর্থ্য তাঁর নেই?

নেই, এ কথা সত্যি, ভেবে দেখলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। জীবনে যে বৃত্তি তিনি বেছে নিয়েছেন, তাকে বৃত্তির চাইতে বরং ব্রত বলাই উচিত। এ বৃত্তি বা এ ব্রত, অর্থাৎ অধ্যাপনা, বেশি পয়সা রোজগারের রাস্তা নয়। কিন্তু সবাই যদি বেশি রোজগারের রাস্তায় ছোটে, তাহলে কম রোজগারের কাজগুলি করবে কে? সমাজে শুধু

কারখানার মালিক, অডিটর, বা ম্যানেজার থাকলেই তো চলবে না, অধ্যাপকও তো দরকার।

কিন্তু এখন আর সেসব কথা ভেবে লাভ কী? প্রয়োজনই বা কোথায়? এই বসন্ত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে, তারপরই তো লুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবী চিরতরে। থাকবে না কোনো কলেজ, কোনো কারখানা, কোনো অফিস, কোনো মানুষ, কোনো কিছু। তখন কোথায় থাকবেন হিমানীর বাবা—নামকরা অডিটর অমর চৌধুরী, কোথায় থাকবেন রাজমোহিনী কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ডক্‌টর পঞ্চানন ভট্টশালী—প্রাচীন নালন্দা আর মহেন-জো-দারো সম্বন্ধে প্রচুর মূল্যবান গবেষণা করে যিনি পণ্ডিতমহলে বিখ্যাত?

বানর কবে ল্যাজ খসিয়ে নরে পরিণত হয়েছিল, ডারুইন তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন নি। তারপর অনেক হাজার বছর ধরে মানুষ সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে, মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার অসাধারণ সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই সবকিছুই তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। হোমার, ভার্জিল, বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র —এঁদের সমস্ত রচনা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে, চিহ্নমাত্রও থাকবে না। বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, গণিত—সর্ব ক্ষেত্রে মানবজাতির বহু শতাব্দীর সাধনার সমস্ত ফল চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে! এঁদের কথা ভাববার জন্য একটি মনেরও অস্তিত্ব থাকবে না!

বসন্তঋতুও আর থাকবে না। পৃথিবীই থাকবে না যখন, তখন বসন্ত আর থাকবে কি করে? এই ঋতুর প্রশস্তি রচিত হয়েছে কত কবিতায়, গাওয়া হয়েছে কত গানে—পৃথিবীর নানা দেশে, নানা ভাষায়, নানা যুগে। এ বসন্তই পৃথিবীর শেষ বসন্ত, এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিমেষ রায়ের মনে হল এই শেষ বসন্তের পরে বাসন্তীও আর থাকবে না, চিরতরে এই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত

শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাবে রাজমোহিনী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী বাসন্তী মিত্র। বসন্ত শুরু হয়েছে বাসন্তীর জীবনে। শুরুতেই শেষ হয়ে যাবে, সে কথা জানে না বাসন্তী। ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। সেই এক দীর্ঘশ্বাসে দুটি জিনিস মেশান—পৃথিবীর সঙ্গে কুমারী বাসন্তী মিত্রের নিশ্চিত ধ্বংস আসন্ন ভেবে অসীম বেদনা, আর সেই আসন্ন ধ্বংসের কথা কিছুমাত্র না জেনে বাসন্তী নিশ্চিন্ত আনন্দে মশগুল আছে ভেবে স্বস্তিবোধ। অনিমেষ রায়েব মনে পড়ল ইংরেজ কবি টমাস গ্রে-র সেই বিখ্যাত উক্তিটি :

'Where ignorance is bliss,
It is folly to be wise'

অর্থাৎ অজ্ঞানেই যেখানে আনন্দ, সেখানে জ্ঞানী হওয়াটা বোকামি। অজ্ঞানের আনন্দেই ডুবে থাকুক বাসন্তী মিত্র, জীবনে বাকি এই কটা দিন। অধ্যাপক অনিমেষ বায়েব কী অধিকার আছে তাঁর ক্লাসের ছাত্রী বাসন্তী মিত্রকে তাব ধ্বংস আসন্ন জানিয়ে দিয়ে এই বাকি কটা দিনের আনন্দ ধ্বংস করে দেবার ?

অনেকের জীবনেই বসন্ত আসে, কিন্তু এমন করে জানানী দেয় না, যেমন দিয়েছে বাসন্তী মিত্রের সারা দেহে, সারা মনে। সোজা কথায় বলা চলে, বসন্ত উদ্দামরূপে ছেয়ে ফেলেছে বাসন্তী মিত্রকে, আর সেই রূপটি চোখে না-পড়া সহজ নয়। বাঙালী-মেয়ে-সুলভ সায়া-সেমিজ-ব্লাউজ-শাড়ির বদলে সালোয়ার-কামিজ-দোপাট্টায় দেহ আবৃত করে কলেজে আসে বাসন্তী মিত্র। অনিমেষ রায়ের মনে পড়ল প্রথম যে দিন মেয়েটি তাঁর ক্লাসে এসেছিল, সে দিন তিনি প্রথম দেখে তাকে বাঙালী মেয়ে বলে বুঝতে পারেন নি। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস-হাজিরা খাতায় নাম ডাকতে গিয়ে জানালেন মেয়েটির নাম বাসন্তী মিত্র। অনিমেষ রায়ের মুখে নিজের ক্রমিক সংখ্যা

শুনে নিজের উপস্থিতি জানাবার জন্যে বাসন্তী যখন সাড়া দিতে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তখন অনিমেষ হাতের কলম হাতেই রেখে কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত চোখে এই ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে থেকে-ছিলেন। তারপর হঠাৎ যখন খেয়াল হয়েছিল তাঁর এই তাকিয়ে থাকাটা ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে, তখন তাড়াতাড়ি বাসন্তীর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তিনি অন্য নাম ডাকতে শুরু করেছিলেন।

বাসন্তীকে সেই প্রথম দেখাটাও অনিমেষ রায়ের জীবনে একটি অসাধারণ বিচিত্র, স্মবণীয়, এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যার স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে ফেলা সম্ভব নয়, হারিয়ে ফেলতে চানও না অনিমেষ বায। তবু হারিয়ে ফেলতে হবেই এই বসন্তের শেষে, তাই ভেবে বিষণ্ণ হয়ে উঠল অনিমেষ রায়েব মন।

হ্যাঁ, রাজমোহিনী কলেজে প্রথম এসেই সাড়া জাগিয়েছিল বাসন্তী মিত্র। অনেকটা তার নিজের অজানিতেই বোধ হয়। অর্থাৎ সাড়া সে জাগাতে চায় নি, সাড়া আপনি জেগেছিল, যেমন বসন্ত এলে কোকিলেরা আপনি গান গেয়ে ওঠে, বসন্ত হয়তো নিজে তাদের খোঁচা মেরে গান গাওয়ায় না। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, নিজে সে যে একটু অসাধারণ, আর পাঁচটি মেয়ের চাইতে চোখে পড়বার মত আলাদা, এ বিষয়ে প্রথমে সচেতন ছিল না, পরে ক্রমে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছিল বাসন্তী মিত্র। বাসন্তী বাবা-মার সঙ্গে ছিল বাংলার বাইরে, সেখানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সালোয়ার-কামিজ-দোপাট্টায়, আর সেই অভ্যাসটাই থেকে গেছে। বাংলায় এসেছে সম্প্রতি, এখনো বেশ বদলান হয়ে ওঠে নি, বদলানটা খুব একটা প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলে মনে হয় নি বলে।

অনিমেষ রায় জেনেছিল তাঁর মেয়ে রীতার মত বাসন্তীও তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান। শুনে, রীতার ওপর স্নেহের মত বাসন্তীর

ওপর একটু অপত্যস্নেহের ভাবও কি এসে পড়েছিল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের অবচেতন মনে? মনে হয়েছিল কি, আর-কয়েকটি বছর পার হলেই বাসন্তীর মত রীতার জীবনেও আসবে বসন্ত?

বাসন্তী মিত্রকে দেখে অতীতের হিমানী চৌধুরীর ছবিও অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের মনের পর্দায় ফুটে উঠেছিল। হিমানীকে প্রথম দেখার রোমাঞ্চ-শিহরণ যেন তিনি নতুন করে অনুভব করছিলেন স্মৃতির যাদুমন্ত্রে। না, সালোয়ার-কামিজ-দোপাট্টা পরত না হিমানী, বাংলাদেশেই সে মানুষ, বাঙালী মেয়েদের মতই বেশভূষা ছিল তার, তবু তারই ভেতর সে ছিল স্বতন্ত্রতায় অনন্যা। সে দিন প্রথম দেখেই হিমানী-মুগ্ধ হয়েছিলেন অনিমেষ রায়, সাধারণ কলেজের অল্প বেতনের নবীন অধ্যাপক অনিমেষ রায়, যাঁর অধ্যাপনার বিষয় দর্শনশাস্ত্র, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফিলজফি'।

হিমানীর সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হয়েছিল কোনো এক সাহিত্য-আলোচনার সভায়। সে সভায় কবিগুরুর একটি কবিতা অপূর্ব আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল হিমানী, উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে; সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ, বেশি অভিভূত হয়েছিলেন দর্শনশাস্ত্রের নবীন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। হিমানী তখন একটি মেয়ে-কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী,—অনিমেষের কলেজের নয়।

সেই সভাতেই কবিতার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘরোয়াভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন অনিমেষ রায়। সাহিত্যে তিনি এম. এ. পাস করেন নি; তাঁর অধ্যাপনার বিষয় দর্শনশাস্ত্র, সুতরাং সাধারণ চলতি ভাষায় 'সাহিত্য তাঁর লাইন নয়', এবং কবিতা-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা তাঁর পক্ষে একরকম অনধিকার চর্চা। কিন্তু তাঁর সে দিনের সেই অনধিকার চর্চার ভেতরই কলেজের ছাত্রী কুমারী হিমানী চৌধুরী সাহিত্যতত্ত্বে তাঁর অসামান্য অধিকারের পরিচয়

পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। মুগ্ধ হয়েছিলেন উপস্থিত সবাই; হিমানী চৌধুরী সবচেয়ে বেশি। সাহিত্যের একাধিক নামজাদা অধ্যাপকের পড়ান শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে হিমানীর, কিন্তু অনিমেষ রায়ের আলোচনা শোনবার আগে সে কল্পনাও করতে পারে নি সাহিত্যে এত পাণ্ডিত্য এবং এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এত অল্পকথায় গুছিয়ে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। হিমানীর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস হল অধ্যাপক অনিমেষ রায় যা বললেন তার বেশির ভাগ তাঁর নিজের বুদ্ধি আর উপলব্ধি থেকে বলা, পরের ভাণ্ডার থেকে ধার-করা কথার সমাবেশ নয়। অর্থাৎ অসাধারণ মৌলিক চিন্তাধারা আছে অনিমেষ রায়ের, এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। তাছাড়া, তিনি আলোচনায় যা যা বললেন, সেসব দামী কথা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার খাতায় লেখবার পক্ষেও খুব মূল্যবান। অথচ এগুলো দেশী-বিদেশী কোনো সাহিত্যপণ্ডিতের গ্রন্থে ছাপা আছে বলে মনে হল না হিমানীর।

সভাভঙ্গের পর রাস্তায় নামবার উপক্রম করতেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কলেজের ছাত্রী, আসন্ন বি.এ. পরীক্ষার্থিনী কুমারী হিমানী চৌধুরী। বলেছিল, 'অভিনন্দন আর ধন্যবাদ জানাতে এসেছি আপনাকে।'

হিমানীকে দেখে আর তার অনুপমকণ্ঠে অনবদ্য রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন অনিমেষ রায়, মনে গভীর আগ্রহের উদয় হয়েছিল হিমানীর সঙ্গে আলাপ করবার, কিন্তু সে আগ্রহকে রূপদানের দুঃসাহস করেন নি। হিমানী নিজেই যেচে এসে আলাপ করাতে তিনি অপ্রত্যাশিত আনন্দ লাভ করে বললেন, 'দুটিই শ্রদ্ধাভরে শিরোধার্য। কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যের হেতুটা জানতে পারলে কৌতূহলটা মেটে।'

এ কথার সবিনয় আন্তরিকতা এবং প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ কৌতুক স্পর্শ

করেছিল হিমানীর হৃদয়কে। হিমানী বলেছিল, 'কবিতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তার তুলনা নেই।'

অনিমেষ রায় হেসে বলেছিলেন, 'তুলনা অনে—ক আছে, আপনি জানেন না। বরং আমি বলব আপনি আজ যে আবৃত্তি শোনালেন, তার তুলনা মেলে না। কবিতাটির আত্মা মূর্ত হয়ে উঠেছিল আপনার কণ্ঠে। শুনে আমার মনে হয়েছিল কবিগুরুর ঐ কবিতাটি আপনার কণ্ঠে আবৃত্ত হবার জন্যেই রচিত হয়েছিল।'

হিমানী বলেছিল, 'সে আমার কৃতিত্ব নয়, আপনার সহৃদয়তা।'

অনিমেষ রায় বলেছিলেন, 'আমিও কি ঠিক তেমনি বলতে পারি না যে অনধিকার চর্চা করে আমি কবিতাতত্ত্ব সম্বন্ধে বকবক করলাম, তা আপনার ভাল লেগেছে আপনারই সহৃদয়তার জন্যে? যাক্ গে, এজাতীয় তর্কের শেষ নেই। আমি মেনে নিচ্ছি আমার আলোচনার তুলনা নেই, আপনিও মেনে নিন আপনার আজকের আবৃত্তি চিরদিন আমার—মানে আপনার আবৃত্তিও অতুলনীয়।'

হিমানীর সুন্দর চোখদুটি আকস্মিক আবেগে চকচক করে উঠেছিল। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে হিমানী হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা, তাই হক।'

একটা জটিল ব্যাপারের মীমাংসা এইভাবে হয়ে গিয়েছিল। এবার দু জনের মাঝখানে নেমে এসেছিল একটা কেমন যেন অস্বস্তিকর নীরবতা। দু জনেরই মুখে যেন বলবার কথা ফুরিয়ে গেছে।

তারপর অনিমেষ রায় বলেছিলেন, 'আচ্ছা, এবার তাহলে আসি। নমস্কার,' বলে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় হিমানী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করি?'

অনিমেষ রায় কিছুটা কৌতুক আর কিছুটা কৌতূহল বোধ করে বলেছিলেন, 'করুন।'

'রাগ করবেন না তো প্রশ্ন শুনে?'

'আমাকে রাগাবার মত প্রশ্ন আপনি করতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার নেই। তবু যদি অভয় চান তো, অভয় দিলাম।'

'আপনার বিষয় হচ্ছে দর্শন। সুতরাং দর্শন-সম্পর্কিত গভীর আলোচনা আপনার মুখে শুনলে বিস্মিত হতাম না। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে আপনি এত জানলেন কি করে? আপনার আলোচনা শুনে মনে হল ইংরেজি, বাংলা আর সংস্কৃত সাহিত্য আপনাব নখদর্পণে।'

অনিমেষ রায় হেসে বলেছিলেন, 'নখদর্পণে কিনা জানি না, তবে ঐ তিনটে সাহিত্যই প্রচুর পড়েছি বটে। অর্থাৎ গোগ্রাসে গিলেছি, এখনও গিলে চলেছি, যদিও হজম কতটা করতে পেরেছি, জানি নে। দর্শন আর সাহিত্য, এই দুটিই পাশাপাশি পড়ে চলেছি, জীবনে এই তো আমার একমাত্র নেশা। আর কোনো নেশা নেই। সাহিত্য আর দর্শন, এই দুয়ের সম্পর্কটা যে খুবই নিকট। সাহিত্য মানে জীবনদর্শন ছাড়া আর কি? অবশ্য কলেজে আমি দর্শনই পড়াই, সাহিত্য পড়াই নে। কিন্তু পড়াতে গিয়ে আমার কী মনে হয় জানেন?

'কী মনে হয়?'

'মনে হয়, অস্কার ওয়াইল্ড্-এর বলা একটি চমৎকার কথা: Those who had no time to learn have taken to teaching—যাঁরা নিজেরাই শিখতে সময় পান নি তাঁরাই শেখাবার ব্রত গ্রহণ করেছেন। তাই ক্লাসে লেক্চার দিতে দিতে—এই যেমন একটু আগে আবোল-তাবোল যা মনে এল বকে গেলাম—'

'মোটেই আবোল-তাবোল বকেন নি আপনি,' বলেছিল হিমানী চৌধুরী।

'বেশ মেনে নিলাম খুব দামী দামী কথা বলেছি,' স্মিতমুখে বলেছিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'এবার আর কী বলবেন বলুন।'

'এবার একটি বিনীত অনুরোধ করব।'

'করুন।'

'আসুন আমার গাড়িতে।'

'আপনার গাড়ি আছে?' হঠাৎ বিস্মিত হয়ে ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করেছিলেন অনিমেষ রায়। বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে, তার নিজের গাড়ি আছে, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই মনে হয়েছিল তাঁর।

হিমানী হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'আমার মানে আমার বাবার।'

অনিমেষ রায় বলেছিলেন, 'ওঃ। কিন্তু আমাকে গাড়িতে যেতে বলছেন কেন?'

'আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।'

'কেন বলুন তো?'

'কিছু আলোচনা কবতে চাই আপনার সঙ্গে। অবশ্য আপনার যদি সময় থাকে।'

'আছে। কিন্তু বিষয়?'

'সাহিত্য। আলোচনার পর গাড়ি করেই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

অনিমেষ রায় বলেছিলেন, 'কিন্তু . . . '

'কিন্তু নয়, আসুন।'

'তার মানে, আপনার বাবার বাড়িতে যেতে হবে আমাকে?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু আপনার বাবার সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই।'

'হতে বাধা কী?'

'কী নাম আপনার বাবার? কী করেন তিনি?'

'শ্রীযুক্ত অমর চৌধুরী। অডিটর।'

এ নাম কখনো শোনেন নি অনিমেষ রায়। কিন্তু প্রকাশ করলেন না সে কথা। ইতস্তত করলেন একটু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠলেন হিমানীর বাবার গাড়িতে। সে দিন যদি গাড়িতে উঠে হিমানীর সঙ্গে অডিটর অমব চৌধুরীর বাড়িতে না যেতেন অনিমেষ রায়, তাহলে অনিমেষ আর হিমানী, দু জনের জীবনের ইতিহাস হত অন্য রকম, আর কে জানে রীতার আবির্ভাব হত কিনা পৃথিবীর বুকে!

কিন্তু বিধাতার বিধান উল্‌টাতে পারে না কেউ, অনিমেষ রায়ও পারেন নি। হিমানীকে তাঁর ভাল লেগেছিল বলেই তার অনুরোধ না রেখে পারেন নি। গিয়েছিলেন অমব চৌধুবীব বাড়িতে, আলাপও হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।

সে দিন দুটি ঘণ্টা যে কী করে ব্রাউনিং, টেনিসন, সুইনবার্ন আর রসেটির কবিতা পড়ায় আব আলোচনায় কেটে গেল, টের পেলেন না অনিমেষ রায়। হিমানীকে পড়িয়ে ভালো লাগল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের, আব দর্শনের অধ্যাপকেব কাছে ইংরেজি কবিতার পাঠ নিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল হিমানী। বিবাট ওস্তাদ গাইয়ে যেমন কোনো জটিল রাগ বা রাগিণীর রূপ অল্পক্ষণেব ভেতরেই অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যা সঙ্গীতে অল্প-দখল-বিশিষ্ট গাইয়ে অনেকক্ষণ গেয়েও পারেন না, তেমনি হিমানীর মনে হল এই দু ঘণ্টার ভেতর এই চার জন কবির কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অনিমেষ রায়। অনিমেষ রায়ের দৃষ্টিতে এই চার জন কবির প্রতিভা যেন নতুন আলোয় দেখতে পেল হিমানী, তার মনে হল এঁদের মর্মের যত গভীরে পৌঁছতে পেরেছেন দর্শনের অধ্যাপক অনিমেষ রায়, তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেন নি—হিমানী যাঁদের কাছে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্যের সেইসব বিখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দ।

‘আচ্ছা, আপনি কলেজে ইংরেজি পড়ান না কেন?’ প্রশ্ন করেছিল হিমানী, বিস্মিতা হিমানী।

'পড়াই নে কেন ? তার অনেকগুলি কারণ আছে,' হেসে বলেছিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

'কী কী কারণ বলবেন কি আমাকে ?'

'নিশ্চয় বলব। প্রথম কারণ হচ্ছে, কবিতাসাহিত্য পড়া আমার একটা ভীষণ রকমের নেশা হলেও কলেজে তা পড়াবার মত দখল আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ, কবিতাসাহিত্যেব রস উপভোগ করা আর করাবার ঠিক যোগ্য জায়গা কলেজের ক্লাস নয়—অবসিকেষু রসস্য-নিবেদনম্ দর্শনে যদি বা সহ্য কবতে পারি—কবতেও হচ্ছে বাধ্য হয়ে—কবিতাসাহিত্যে তা সহ্য হবে না। আর তৃতীয় কাবণ হচ্ছে, আমি ফিলজফিতে এম.এ., ইংরেজি সাহিত্যে নই, সুতবাং কলেজে আমি ইংরেজি পড়াতে চাইলেও কলেজ তা আমাকে দেবে কেন ?'

'সেইটেই আসল কারণ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল হিমানী। 'আর ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভাগ্য।'

'দুর্ভাগ্য ? কেন ? তাদেব আমি দর্শন পড়াই বলে ?'

'না। ইংরেজি কবিতা পড়ান না বলে। যাবা আপনার কাছে ইংরেজি কবিতা পড়ে নি তাবা জানে না আপনাব কাছে ইংবেজি কবিতা না পড়ে তাঁরা কী হাবিয়েছে, অথবা কী থেকে বঞ্চিত থেকেছে।'

'আপনি তা জানলেন কি কবে ?'

'আপনাব কাছে পড়ে।'

'সে কি ! আমি আপনাকে পড়ালাম কখন ?'

'বাঃ, এতক্ষণ তাহলে কী করলেন আপনি ?'

অনিমেষ রায় বললেন, 'ওঃ, এতক্ষণ যা বক্‌বক্ করলাম তাকে যদি পড়ান বল্লেন, তাহলে অমন পড়া আমি আপনাকে আরো অনেক পড়াতে পারি।'

অনিমেষ রায়ের মনটা নিতান্ত সাদাসিধে, সংসারে চলতে যে-

জাতের বুদ্ধির দরকার, সে-জাতের বুদ্ধির কিছু অভাব বরাবরই ছিল তাঁর মগজে। এ কথাটা খুব ভেবেচিন্তে হিসেব করে তিনি বলেন নি, বুঝতে পারেন নি নিজের এই কথার ফাঁদে তিনি নিজেই কিভাবে জড়িয়ে পড়বেন।

হিমানী যেন এমনি একটা সুযোগ খুঁজছিল এতক্ষণ। বলল, 'তাহলে আরো পড়ব আমি আপনার কাছে। কথা দিন, পড়াবেন আমাকে। আমার বি.এ. পরীক্ষার কয়েক মাস মাত্র বাকি। এই কয়েকটা মাস অন্তত।'

সর্বনাশ! হিমানী কি তাঁকে মাস্টারি করতে বলছে নাকি? তামাশা করছে না তো? না। হিমানীর মুখের দিকে তাকিয়ে তো মনে হল না, সে তামাশা করছে, অথবা তাঁর সঙ্গে তামাশা করবার কল্পনাও সে করতে পারে। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে, গুরুত্ব দিয়েই কথাটা বলেছে হিমানী।

'মাফ করবেন আমাকে,' বলেছিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'আপনি আমাকে যে অনুরোধ করছেন, আর যেভাবে অনুরোধ করছেন, আপনার বি.এ. পরীক্ষার আর মাত্র কয়েক মাস বাকি সে সম্বন্ধে আগেই হুশিয়ারি দিয়ে, তাতে আমার ভয় হচ্ছে—ভগবান না করুন—আপনি আমাকে আপনার মাস্টারি করতে বলছেন।'

'যদি তাই বলি, আপনার আপত্তি হবে কি তাতে?' প্রশ্ন করেছিল হিমানী চৌধুরী। 'আপনি কি মাস্টারি করেন না?'

'কলেজের বাইরে করি না,' বলেছিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'অবশ্য আমার যে বিষয়, অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র, তাতে প্রাইভেট টুইশন করবার আহ্বান যে প্রচুর আসে, তা নয়। শুনতে পাই ইংরেজির অধ্যাপক যাঁরা, তাঁদের অনেক বাড়িতে মাস্টারি করবার জন্যে ডাক পড়ে, এবং বেশ ভাল দক্ষিণায়, কিন্তু দর্শনের অধ্যাপকদের ভাগ্য তার

কাছাকাছিও ভাল নয়। অর্থাৎ প্রাইভেট টুইশনের বাজারে তাঁদের তেমনি চাহিদা নেই। তবু—'

'তবু . . . ?'

'কয়েকটি ডাক পেয়েছিলাম। বেশ প্রবল, আগ্রহ-ভরা ডাক। সে ডাকে সাড়া দিই নি। না, ভুল বললাম। সাড়া দিয়েছিলাম, কিন্তু ক্ষমা চেয়ে, সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারব না জানিয়ে। যাঁরা ডাক দিয়েছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন আমার সেই ক্ষমাপ্রার্থনা শুধু নিজের দর বাড়াবার কৌশল মাত্র। দর তাঁরা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু আমার ক্ষমাপ্রার্থনার বিদায়-নমস্কার আমি ফিরিয়ে নিই নি।'

'অর্থাৎ প্রাইভেট টুইশন করতে আপনি রাজি হন নি। কিন্তু কেন বলুন তো? আপনার কি অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজন নেই?'

'যেটুকু প্রয়োজন তা আমি কলেজ থেকেই পাই,' বলেছিলেন অনিমেষ রায়। 'কারণ আমার প্রয়োজন সামান্যই। আমার মা থাকেন ডায়মণ্ড-হারবারে তাঁর একমাত্র কন্যা আর জামাতার কাছে, আর আমি, মার একমাত্র পুত্র, কলকাতার কলেজের মাস্টার, থাকি কলেজের হোস্টেলে। মাসে মাসে মার জন্যে টাকা পাঠিয়ে আর আমার খরচা মিটিয়েও কিছু টাকা প্রত্যেক মাসে উদ্‌বৃত্ত থাকে। তার অঙ্কটা কাড়কে শোনাবার মত নয়, আপনাকে তো নয়ই; তবু সেটা মাসে মাসে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে, ডাকঘর জমা নিতে আপত্তি করছে না।'

'আপনার বাবা কোথায় থাকেন?' সসংকোচে প্রশ্ন করেছিল হিমানী।

'স্বর্গে,' বলেছিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

শুনে দুঃখিত, আর একটু লজ্জিতও বোধ করেছিল হিমানী। 'ক্ষমা করবেন। আমি জানতাম না আপনার বাবা নেই।'

'নেই, বলি নি তো। বলেছি, স্বর্গে আছেন। সত্যিই তাঁর

অস্তিত্ব আমি অনুভব করি। এ শুধু আপনাকেই বললাম; আর কাউকে বলি নি, বলি নে। শুনে আপনি হয়তো হাসবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, বাবা নেই, এ আমার মনেই হয় না। জানি তিনি দেহে নেই, কিন্তু দেহে থাকাটাই তো একমাত্র থাকা নয়।'

পিতৃহীন অনিমেষ রায়েব মুখে এ কথা মন্ত্রের মত কাজ করেছিল মাতৃহীনা হিমানীর মনে।

'আপনি দার্শনিক, জীবনের অনেক দুঃখকে দার্শনিকভাবে সয়ে নিতে পারেন,' বলেছিল হিমানী। 'কিন্তু আমার মা নেই, এ আমি কিছুতে ভুলতে পারি নে।'

কী কথা বলতে হঠাৎ কী কথা এসে পড়ল। দুঃখিত হলেন অনিমেষ রায়। হিমানীর সঙ্গে জীবনে এই তাঁর প্রথম আলাপ, তবু হিমানীর চোখে অশ্রুর আভাস দেখে তাঁর মন-খারাপ হয়ে উঠল। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়েকে দার্শনিক বক্তৃতা শোনাতে ইচ্ছে হল না তাঁর, তবু তার এই গভীর বেদনায় একটু সত্যিকারের সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। বললেন, 'আপনার মাকে ভুলতে বলি নে। কিন্তু আপনার মা নেই, এইটে ভুলে যান, কারণ এ সত্যি নয়। আপনার মা আছেন, এইটেই সত্য, এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।'

হিমানীর মনে হল এতবড় সত্য কথা তাকে কেউ কখনো শোনায় নি, এতখানি গভীর সান্ত্বনাও কেউ তাকে কোনো দিন দিতে পারে নি। অনিমেষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর বিশ্বাসে ভরে উঠেছিল তার মন; মনে হয়েছিল ইনি শুধু দর্শন পড়ান না, দার্শনিক তত্ত্ব নিজের জীবনে গভীরভাবে উপলব্ধিও করেছেন, তিনি জীবন-দার্শনিক।

মাকে হারিয়ে জীবনে একটা দুঃসহ শূন্যতা বোধ করেছিল হিমানী, স্কুল-জীবনের শেষে কলেজ-জীবনে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই। মনে হয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন নিবে গেছে। বাবার ভালবাসায়

মাতৃহীনতার ব্যথা কিছুটা ভোলবার চেষ্টা করেছিল হিমানী। কিন্তু তার বাবা অডিটর অমর চৌধুরী বছরখানেক বাদেই গৃহকে আর লক্ষ্মীহীন রাখা উচিত মনে করলেন না, তাছাড়া ভাবলেন চৌধুরী-বংশটা যাতে রক্ষা পায় সে ব্যবস্থাও করা দরকার। ব্যবস্থা হল। হিমানীর বিমাতা এলেন। তাতে বাইরের হিসেবে কিছু অভাব ঘটল না হিমানীব, কিন্তু ভেতবেব হিসেবে মাতৃহীনা হিমানী পিতৃহীনাও হল, বাবার সঙ্গে শুধু বাইরেব স্থূল সম্পর্কটা ঠিকই রইল, ছিন্ন হয়ে গেল আগেকার সেই সূক্ষ্ম আত্মিক সংযোগ।

.তারপর জন্ম নিল অডিটর অমর চৌধুবীর বংশধর। হিমানীর মনে হল তাব স্বর্গীয়া জননী আরো দূবে সবে গেলেন এই সংসাব থেকে, তার বাবাব মন থেকে। প্রথমা পত্নীব কথা যেন একেবাবেই ভুলে গেলেন অডিটর অমব চৌধুবী।

এসব কথা জানা হয়ে গেল অনিমেষ রায়েব, যদিও এসব শোনাব আগ্রহ তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। তিনি অনুভব করলেন হিমানীব বাইবের প্রশান্তিব আড়ালে রয়েছে হৃদয়ভরা গভীর বেদনা, মায়ের অভাবেব চাইতে এ বাড়িতে মায়ের স্মৃতিব অমর্যাদাই তাকে মর্মাহত করেছে বেশি। অনিমেষ রায়েব হৃদয় ভবে উঠল হিমানীর প্রতি গভীর সমবেদনায়।

অমর চৌধুবীর সঙ্গে হিমানী আলাপও সে দিন করিয়ে দিয়েছিল অনিমেষ রায়েব। রীতিমত কায়দা-দুরস্ত ভদ্রলোক অমর চৌধুবী, কিন্তু কাঠখোট্টা সংসারী মানুষ, আবেগের বালাই নেই বললেই চলে। কায়দা-মাফিক ভদ্রতার অভাব নেই, অভাব শুধু ভদ্রতার অতীত সেই আন্তরিকতার, যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে।

সে দিন চৌধুরী-বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সারাক্ষণ হিমানীর বেদনার কথা ভেবে ব্যথিত বোধ করছিলেন অনিমেষ রায়। একবার মনে হল হিমানীর সঙ্গে এভাবে তাঁর আলাপ এবং অন্তরঙ্গতা ঘটিয়ে

দিয়ে তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি বিধাতা, তাঁর ওপর পরের ভাবনা চাপিয়ে দিয়েছেন মনের শান্তি নষ্ট করে দেবার জন্য। বরাবরই ভাবপ্রবণ, সহানুভূতিশীল দার্শনিক হৃদয় অনিমেষ রায়ের; কিন্তু এত দিন তিনি যত ব্যথা, যত সহানুভূতি বোধ করছেন সবই ব্যথিত, নিপীড়িত মানবতা বা মানবজাতির জন্য, কোনো বিশেষ মানবের বা মানবীর জন্যে নয়। ঐ ধরনের ব্যাপক সহানুভূতি বা দরদে সুবিধা বেশি, ঝামেলা বা দায়িত্ব কম। কিন্তু সে দিন বিধাতার অমোঘ চক্রান্তে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল একটি মাতৃহীনা মানবীর বেদনায়, যার সঙ্গে মাত্র সে দিনই তাঁর পরিচয়, তাব আগে পৃথিবীতে যার অস্তিত্বই তাঁর জানা ছিল না। অথচ এই পরিচয়ের পর মনে হল না এইমাত্র প্থম পরিচয় হয়েছে। ভেবে বিস্ময় বোধ করলেন নবীন অধ্যাপক অনিমেব রায়। বেদনার যাতুমন্ত্রেই যেন তাঁর হৃদয় জুড়ে বসেছে হিমানী চৌধুরী।

'কিন্তু কী করতে পারি আমি?' ভাবলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায় সে রাতে কলেজের হোস্টেলে খোলা ছাতে চাঁদের আলোয় পায়চারি করতে করতে। 'মাতৃহীনাকে মাতৃহীনতার ব্যথা আমি ভোলাব কেমন করে? তার কাছে যে পিতৃহীন নিরানন্দ, তাকে আমন্দময় করে তোলবার যাতু কি আমার জানা আছে?'

তারপর অনিমেষ রায়ের মনে হল ঈশ্বরের কথা। দয়াময়, পরম-কারুণিক প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হয় তাঁকে, ভক্তদের গানে তিনি দয়াল ঠাকুর বা দয়াল হরি, ঈশ্বরের ব্যবহার মানুষের প্রতি যে কতখানি ন্যায়সঙ্গত এবং যথোচিত সেইটে বোঝাবার জন্য ইংরেজ কবি মিল্‌টন তাঁর 'প্যাবাডাইজ লস্ট' মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। কিন্তু অমন মধুর স্বভাব আর মিষ্টি চেহারার মেয়ে হিমানী চৌধুরীকে মাতৃহীনতার ব্যথাটা না দিলে কি পরম দয়াময় পরমেশ্বরের কিছুতেই চলছিল না?

ঈশ্বরের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে এর আগে কোনো দিন মাথা ঘামান নি অনিমেষ রায়। এইবার সদ্যপরিচিতা কলেজের ছাত্রী হিমানী চৌধুরীর জীবনের ট্রাজেডির ধাক্কায় তাই নিয়ে সর্বপ্রথম মাথা ঘামালেন তিনি।

পরদিন যথারীতি কলেজে গেলেন এবং রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নিলেন অনিমেষ রায়। কিন্তু সে দিন পড়ানর ব্যাপারে যেন তেমন উৎসাহ পেলেন না, বার বার তাঁর মনে হতে লাগল হিমানী চৌধুরীব মা নেই। কী পাপ করেছে হিমানী, যার জন্যে মা-হারানর ব্যথা সইতে হল তাকে? অসম্ভব। এতবড় ব্যথার শাস্তি পাবার যোগ্য অপরাধ করা হিমানীর মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তবে কেন তার এই শাস্তি?

নিজের মার কথা মনে পড়ল অনিমেষ রায়ের। মা আছেন ডায়মণ্ড-হারবারে। চোখের সামনে নেই, কিন্তু আছেন, ডায়মণ্ড-হারবারে গেলেই দেখা হবে। মা বেঁচে নেই, এ কথা কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন তিনি। শিউরে উঠলেন, দেখলেন সে কল্পনা অসহ্য। এই মাতৃহীনতার ব্যথাই সয়ে আছে হিমানী! হায়, দুঃখিনী হিমানী!

কলেজের শেষে বেরিয়ে কী মনে হল, ডাকঘর থেকে হিমানীকে ফোন করলেন অনিমেষ রায়। কে কী মনে করবে, বা কেউ কিছু মনে করবে কিনা সে বিষয়ে ভাবলেন না একবারও। এমনি নিশ্চিন্ত বেপরোয়ামি-ই অনিমেষ রায়ের স্বভাব।

বিধাতার মেজাজ বোধকরি ভাল ছিল। ফোন ধরল হিমানী-ই। হিমানীর বাবা তখন তাঁর অডিট-কোম্পানির অফিসে।

'কী করছেন বলুন তো মিস্, না কুমারী, না সোজাসুজি হিমানী দেবীই বলব আপনাকে,' বললেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'বলুন তো, কী করছেন এখন? অবশ্য আমার ঠিক সেইটে জানা উদ্দেশ্য নয়।'

'তবে প্রশ্ন করছেন কেন?' হিমানী প্রশ্ন করেছিল সকৌতুকে। 'ঠিক কী জানা আপনার উদ্দেশ্য?'

অনিমেষ রায় বললেন, 'আমার আসল প্রশ্নটা হচ্ছেঃ আমি কি এখন যেতে পারি আপনার কাছে? অর্থাৎ আপনার কোনো রকম অসুবিধা হবে না তো যদি আমি যাই?'

'অসুবিধা? আমি আশাতীত সৌভাগ্য মনে করব। আপনি এখন কোথায় আছেন বলুন। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অনিমেষ রায় বললেন, 'না না, গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। আমি ট্রামে-বাসেই ঠিক যেতে পারব।'

গিয়েছিলেন অনিমেষ রায়।

আরো কিছু ইংরেজি কবিতা তাঁর কাছে পড়ে নিয়েছিল হিমানী, দু জনেরই হৃদয়ের মুগ্ধতা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনেই শেষ নয়, আরো গেলেন, আরো যেতে লাগলেন অধ্যাপক অনিমেষ। তারপর যাওয়াটা যেন নেশা হয়ে উঠল তাঁর, এবং হিমানীর মনেও যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল অনিমেষের নেশা।

তারপর একদিন হিমানী বলল, 'আপনার মাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।'

'কেন বলুন তো?'

'আমার মা নেই বলে। চলুন না একদিন।'

সত্যিই হিমানী একদিন অনিমেষ রায়কে নিয়ে চলে গেল ডায়মণ্ড-হারবার। গিয়ে মুগ্ধ হল অনিমেষের মাকে দেখে। অনিমেষের মা-ও মুগ্ধ হলেন হিমানীকে দেখে। অনিমেষের বোনও তাই।

'আমার মা নেই। মা বলে ডাকব আপনাকে,' বলল হিমানী। মাতৃহারা মেয়েটিকে মাতৃস্নেহে বুকে টেনে নিলেন অনিমেষের মা।

তারপর হিমানীর বরমাল্য গলায় পড়ল অনিমেষ রায়ের। যে-বাড়িতে তার মায়ের সম্মান রক্ষিত হয় নি সে-বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে চলে এল হিমানী চৌধুরী। কলেজের হোস্টেল ছেড়ে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে একটি বাড়ির একতলার ভাড়াটে হলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়, মাকে নিয়ে এলেন ডায়মণ্ড-হারবার থেকে। বৃদ্ধা ছিলেন কন্যা-জামাতার কাছে। জীবনের শেষ কটি বছর কাটিয়ে গেলেন পুত্র আর পুত্রবধূর কাছে। বিদায় নেবার আগে দেখে গেলেন নাতনীর মুখ।

রাজমোহিনী কলেজের নতুন ছাত্রী, বাংলায় নবাগতা বাসন্তী মিত্রকে দেখে হিমানীর জীবনের এইসব অতীত দিনের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল অধ্যাপক অনিমেষ রায়েব। জীবনে নববসন্তের আগমনে যৌবনচঞ্চলা কুমারী বাসন্তী মিত্র। তার নামের সঙ্গে বেশেব সামঞ্জস্য নেই, তবু এই অসামঞ্জস্য বিসদৃশ ঠেকে না চোখে বা মনে, এমনই একটা সহজ, সতেজ, কুণ্ঠাহীন মাধুর্য আছে মেয়েটির মধ্যে।

বসন্ত এসেছে বাসন্তী মিত্রের জীবনে, অঙ্গে অঙ্গে স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেহে মনে বাসন্তী অনুভব করছে যৌবনের দুর্বার তরঙ্গস্রোত। বাসন্তীর জীবনে প্রথম বসন্ত। বাসন্তী জানে না এই তার জীবনের শেষ বসন্ত, কারণ এবারের বসন্তই পৃথিবীর শেষ বসন্ত। হায় বাসন্তী! না-জানার নিশ্চিন্ত আনন্দে মশগুল হয়ে আছে সে। আসন্ন মহাপ্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কাগজে কাগজে মুখে মুখে ছড়ান, শুনেছে সেও, কিন্তু শুনে কৌতুকবোধই করেছে, বিশ্বাস করে নি।

বাসন্তী মিত্রের কথা ভাবতেই সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ রায়ের মনে পড়ে গেল অশোক কাঞ্জিলালের কথা। গত চার বছর ধরে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে আসছে অশোক কাঞ্জিলাল। রাজমোহিনী কলেজে এত বছর আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে নি।

বি.এ. পরীক্ষা একবারও দেওয়া হয় নি তার, প্রতি বছরই টেস্ট-পরীক্ষার আগে সে হাওয়া বদলাতে চলে গেছে।

বড়লোকের ছেলে, দামী রেসিং-কার নিজেই ড্রাইভ করে কলেজে আসে, কলেজের দারোয়ান এবং বেয়ারাদের বখশিশ দিতে দিল্‌দরিয়া, দরাজ-হস্ত। কোনো ক্লাসেই কখনো বই আনে না, এবং পিছনের সারিতে ছাড়া কখনো বসে না। ছাত্রমহলে তার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। প্রতি বছবই কলেজ ইউনিয়নেব সেক্রেটারি-পদে তার মনোনীত প্রার্থীই খুব বেশি ভোটে জিতে নির্বাচিত হয়ে আসছে। নিজে সে কখনো নির্বাচনে দাঁড়ায় না, কিন্তু তার মনোনীত প্রার্থীর জন্য প্রতি বছরই কলেজে নির্বাচনী অভিযানে সে প্রচুর পয়সা খরচ করে আসছে, এবং ভবিষ্যতেও কববে আশা করা যায়। বি.এ. পাস করে ফেললে আব এ কলেজে থাকা যাবে না এবং কলেজ ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করা যাবে না, হয়তো এই কারণেই বি.এ. পবীক্ষা দেয় না অশোক কাঞ্জিলাল, পাছে কোনো বাব পাস কবে ফেলে। কিন্তু অনিমেষ রায়েব বিশ্বাস, পাস কবা অশোকেব পক্ষে সম্ভব নয়। প্রয়োজনও নেই, কারণ চেক সই কবতে পাবে অশোক, আর চেক সই করলেই টাকা আসে। টাকার অভাব তাব হবে না কোনো দিন। এইজন্যই অনিমেষ রায় মনে কবেন অশোক কাঞ্জিলালের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যে ভবিষ্যৎ নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলবার প্রয়োজন হয় না, অনিমেষ রায়েব মতে সে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎই নয়।

অনিমেষের পড়ান বিষয় নিয়েছে অশোক কাঞ্জিলাল। অর্থাৎ দর্শন। আই.এ.তে তার লজিক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ছিল, অতএব বি.এ.তে উঠে দর্শন পড়বার তার অধিকাব আছে। সেই অধিকার কাজে লাগিয়েছে অশোক কাঞ্জিলাল। নিয়েছে দর্শন, কাজেই বসতে আসে অনিমেষ রায়ের ক্লাসে। হ্যাঁ, শুধু বসতেই সে আসে, সে কথা ভাল করেই জানেন অধ্যাপক অনিমেষ বায়। পড়তে আসে না, পড়া

শুনতে আসে না বড়লোকের আদুরে দুলাল অশোক কাঞ্জিলাল। কলেজে মাসে মাসে সে নিয়মিত মাইনে দেয়, সে যেন বিচিত্র প্রমোদ-অনুষ্ঠানে সীজন্ টিকেট কেনা, সুতরাং রুটিন-মত ক্লাসে ক্লাসে এসে তামাশা দেখবার অধিকার সে পয়সা দিয়ে কিনেছে বলা চলে। আর এ তো স্কুল নয় যে পড়া নেওয়া চলবে ; এ হল কলেজ। এখানে অধ্যাপকদের কাজ হচ্ছে একতরফা বক্‌বক্ করে যাওয়া, এবং তার আগে নাম ডেকে ডেকে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা-চিহ্ন অর্থাৎ 'পার্সেণ্টেজ' দেওয়া। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর কাছে ঐ 'পার্সেণ্টেজ'টাই আসল। ব্যতিক্রম দু-চার জন মাত্র, সে কথা জানেন অনিমেষ রায়। সেই দু-চার জনের ব্যতিক্রমের কথা ভেবে তাদের লক্ষ্য করেই ক্লাসে পড়ান তিনি ; এই ব্যতিক্রম ছাড়া ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে শূন্য মাত্র, তাদের নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। অধ্যাপক-জীবনের প্রথম দিকে লক্ষ্য করতেন ক্লাসের একাধিক ছাত্র বসে বসে ঝিমোচ্ছে অর্থাৎ দিবানিদ্রা উপভোগ করছে, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন যে এদের নাসিকা গর্জন করছে না। তারপর এ ধরনের দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর যখন সয়ে গেল, তখন থেকে তিনি সচেতনভাবে লক্ষ্য করার প্রয়োজন-বোধ হারিয়ে ফেললেন।

অশোক কাঞ্জিলালের একটা বিশেষত্ব এই যে, ক্লাসে সে দিবা-নিদ্রা উপভোগের চেষ্টা করে না। প্রয়োজন-বোধ করে না বোধহয় ; সোনার বাংলার অনেক ছাত্রের মত তার দেহযন্ত্র অতটা নির্জীব নয়।

কলেজের অনতিদূরে একটা হাল-ফ্যাশানের রেস্তোরাঁ আছে, তার নাম 'কাফে-ডি-কলেজ'। রাজমোহিনী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সেটি একটি পরমপ্রিয় সমাগম-তীর্থ বা 'রঁদিভু'। এটি পছন্দ নয় অনিমেষ রায়ের, কিন্তু তাতে কী আসে যায় 'কাফে-ডি-কলেজ'-এর, কী আসে যায় রাজমোহিনী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের? তাছাড়া অনিমেষ রায়ের মর্জিমত দুনিয়া চলবে, এমন কী কথা

আছে? সুতরাং মনের অপছন্দ মনেই চেপে রাখেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। দু-একবার আভাসে ইঙ্গিতে নিজের মনোভাব জানাতে চেষ্টা করেছিলেন রাজমোহিনী কলেজের অধ্যক্ষকে এবং সহকর্মী কয়েকজন অধ্যাপককে। দেখেছিলেন তাঁদের চিন্তাধারা অন্য রকম। তাঁদের ধারণা এই হল যুগধর্ম, একে অস্বীকার করা মানেই নিতান্ত সেকেলেপনা, যাব আরেক নাম মূর্খতা। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠী ভাষায়ঃ 'যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?' এ হল যৌবন-জল-তবঙ্গ, প্রবল জোয়ার, বারণ মানবে কেন? একে রুখতে গেলে রোখা যাবে না, শুধু ব্যর্থতার অপমান সওয়াই সাব হবে।

এই কাফে-ডি-কলেজের পাশ দিয়েই অনিমেষ রায়ের বাড়ি থেকে কলেজে, আব কলেজ থেকে বাড়িতে যাতায়াতেব পথ। বিভিন্ন সময়ে এ পথে যাতায়াত করতে হয় অনিমেষ রায়কে। এহেন একটি আড্ডার জায়গা কলেজেব এত কাছাকাছি থাকা উচিত হয় নি। এ কথা বহুবার মনে হয়েছে তাঁর। আব, এত কাছে থাকল যদি বা, কিন্তু 'কাফে-ডি-কলেজ' নামকরণ হল কেন? এর ফলে যেন এই রেস্তোরাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল রাজমোহিনী কলেজের। এই নামের যাদুতেই কাফে-ডি-কলেজ আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে কলেজের ছাত্রছাত্রীদেব ওপর, তারা এড়াতে পারে না এর আকর্ষণ।

অনিমেষ রায়ের সবচেয়ে যা খারাপ লাগে তা হচ্ছে এই কাফে-ডি-কলেজের আড্ডার 'হিরো' বা 'নায়ক' হচ্ছে অশোক কাঞ্জিলাল। কাফে-ডি-কলেজের মালিক কালোবরণ মাইতি—যিনি এ তল্লাটে 'কালোবাবু' নামে বিখ্যাত—অশোক কঞ্জিলালের পরম ভক্ত, কারণ অশোক তাঁর সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। বাকির কারবার তাঁকে করায় না অশোক, তিন শো টাকা তাঁর তহবিলে সে আগাম জমা দিয়ে রেখেছে 'সিকিওবিটি' হিসেবে; সে সারা মাসে যখন যত খুশি

নিজে খায় আর বান্ধব-বান্ধবীদের খাওয়ায়, তার হিসেব খাতায় লিখে রাখেন কালোবাবু আর মাসের শেষে বিল দাখিল করেন অশোক কাঞ্জিলালের কাছে, অশোক সঙ্গে সঙ্গে চেক সই করে দেয় কালো-বরণ মাইতির হাতে। চেক-বই তার সঙ্গেই থাকে সর্বদা—কারেন্ট অ্যাকাউন্টের চেক-বই। কালোবাবুর দাখিল-করা হিসেব পরীক্ষা করে না অশোক, চোখ বুলিয়েও ছ্যাখে না, কোনো প্রশ্নও করে না, ছ্যাখে শুধু টাকার অঙ্কটা, ওটা চেকে লিখতে হবে বলে। কালোবাবু জানেন অশোকের এই দিল্‌দরিয়া উদার বিশ্বাসের কথা, এবং তার ফলে বিল তাঁর পাকা ব্যবসাদারী হাতে যেমন হবার তেমনি হয়।

টিন টিন দামী সিগারেট ওড়ায় অশোক কাঞ্জিলাল। নিজের ঠোঁটে চেপে যত সিগারেট ছাই করে, তার চাইতে বিতরণ করে অনেক বেশি। এই সিগারেটেরও যোগান দেয় কাফে-ডি-কলেজের মালিক কালোবাবু। কারণে অকারণে নিজের বাড়িতে এবং অন্যত্র পার্টি দেয় অশোক কাঞ্জিলাল, তার প্রত্যেকটিতে আহার্য, পানীয় এবং ধূমপানের ব্যবস্থা যোগায় কাফে-ডি-কলেজ। আর, বছরে একবার করে আসে রাজমোহিনী কলেজের ইউনিয়নের নির্বাচনী মরশুম, সারা বছরের সবচেয়ে জমকালো এবং হৈ-হল্লা-মুখর মরশুম। এই মরশুমে যাদের যাদের হৃদয়ে পুলকের জোয়ার বইতে থাকে তাদের ফর্দে সবার ওপরের নামটি 'কালোবরণ মাইতি', কারণ অশোকের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ক্যান্‌ভাসিং, প্রোপাগাণ্ডা, এবং 'ভোট্ ফর' 'ভোট্ ফর' বলে চিৎকার করবার জন্য অশোক নিজেই যাদের বাছাই করে নেয়—এবং এই বাছাইর ব্যাপারে কঞ্জুষপনা একেবারে নেই অশোক কাঞ্জিলালের—তারা নির্বাচনী হুল্লোড়ের দিনগুলোতে প্রচুর চপ-কাটলেট-ওমলেট চা-কফি-কোকো ইত্যাদি আহার এবং পান করে কাফে-ডি-কলেজে, যত খুশি এবং যত বার খুশি। কালোবাবুর ওপর অশোক কাঞ্জিলালের ঢালাও হুকুম আছে

এদের পুরো তৃপ্তি দিতে যেন কোনো রকম ত্রুটি না থাকে। তারপর অশোকের খাড়া-করা প্রার্থীর জয় ঘোষিত হলে পর অশোক বিজয়ী এবং পরাজিত, এই দু পক্ষের স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদের এবং প্রতিযোগীদের বেশ ভাল করে একটা যুক্ত পার্টি দেয় কাফে-ডি-কলেজে। কাজেই নির্বাচনী হপ্তায় বেশ মোটা টাকাই খরচ করে অশোক কাঞ্জিলাল, আর সব টাকাই যায় কাফে-ডি-কলেজের মালিক কালোবরণ মাইতির পকেটে।

অজস্র টাকা আছে অশোক কাঞ্জিলালের, তাই সে টাকা ওড়ায় খোলামকুচির মত, টাকার ওপর একেবারেই মায়া করে না, মায়া করবার দরকার নেই বলে। টাকা যে তার অজস্র আছে এইটে নানা কায়দায় সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার আর্টে মস্তবড় পাকা আর্টিস্ট অশোক। না, আর্টিস্ট বলা হয়তো ভুল, কারণ এ ব্যাপারে অশোকের আচরণে একটু বেশিরকম স্থূলতা আছে বলে ধারণা অনিমেষ রায়ের, নিজের বড়মানুষি জাহির করবার একটা উগ্র বাড়াবাড়ি। অন্যান্য অধ্যাপকেরা বলেন, 'টাকা আছে, খরচা করছে। তা এমন মন্দ কি? কোনো রকম বদখেয়াল তো নেই।'

অনিমেষ রায় ভাবেন বদখেয়াল বলতে আমরা নৈতিক চরিত্রের যে-জাতীয় অধঃপতন বুঝি, তা হয়তো নেই অশোকের, কিন্তু টাকা নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলছে, তাও কি একরকমের বদখেয়াল নয়? তাছাড়া, এই ছিনিমিনি খেলার পথ দিয়েই তার চরিত্রে অন্য রকম বদখেয়াল ঢুকতে বাধা কোথায়? এখন অশোকের বাবা বেঁচে আছেন মাথার ওপর; কিন্তু তাঁর অনেক বয়স হয়েছে, তিনি আর বেশী দিন বেঁচে থাকবেন না। তিনি ইহলীলা সংবরণ করলে তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে অশোক কাঞ্জিলাল, তার মাথার ওপর থাকবে না কোনো অভিভাবক, জুটবে অনেক মতলববাজ বন্ধু,

বয়স্য, মোসাহেব, তখন দ্রুতবেগে গড়িয়ে রসাতলের দিকে অধঃপতন শুরু হতে দেরি হবে না অশোক কাঞ্জিলালের।

শুধু তাই নয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠে শনিবারের বিকেলে ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরতে শুরু করেছে অশোক। অনেক টাকা ঢেলে এসেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, একটা বাজিও জেতে নি। আরো ঢালছে, আরো ঢালবে। টাকার জন্যে এতটুকু শোক নেই অশোকের মনে, বরং টাকার বাজে খরচেই আছে আনন্দ।

লম্বা-চওড়া দেহ, গায়ের রং অত্যন্ত বেশিরকম ফরসা, মুখের চেহারায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র নেই। অনিমেষ রায়ের মন অনুদার নয়, তবু অশোক কাঞ্জিলালের দিকে তাকালেই তাঁর মনে হয় এ ছোকরা সমাজের 'অ্যাসেট' নয়, 'লায়েবিলিটি'—সম্পদ নয়, আপদ। এর মনে ঢুকছে না কাল্‌চার, অথচ পকেটে অজস্র টাকা। সরস্বতী-পরিত্যক্ত এই লক্ষ্মীর বরপুত্রটির ভেতরে একটি ভাবী ভিলেনের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পান অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

তা হক। সেজন্য চিন্তিত হতেন না তিনি। তরুণদের ভেতর ভাবী ভিলেন আরো অনেক আছে, থাকবেও। কিন্তু তিনি চিন্তিত হয়েছেন বাসন্তী মিত্রের অবস্থা দেখে। এই মেয়েটাকে যেন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অশোক কাঞ্জিলালের অশুভ প্রভাব। অশোকময় হয়ে গেছে বাসন্তী মিত্রের মন, অশোককে তার জীবন-নাটকের নায়ক বলে ভাবতে শুরু করেছে সে। অশোকের সঙ্গলাভের অজুহাত খুঁজে বেড়ায় সে, আর-কোনো সুযোগ পেলে ছেড়ে দেয় না। কলেজ ইউনিয়নের ছাত্রীদের প্রতিনিধি হয়েছে বাসন্তী মিত্র। আর সেক্রেটারি দীপঙ্কর দত্ত। ইউনিয়নের কাজের ছলে দীপঙ্করের সঙ্গে নানা ছুতোয় আলোচনা করে বাসন্তী, জানে অশোকদার পরামর্শ ছাড়া এক পা নড়ে না দীপঙ্কর। তখন দীপঙ্করের সঙ্গে যেতে হয় অশোক কাঞ্জিলালের কাছে।

অশোকের পেছনে ঘুরতে বাসন্তীকে অনেক দেখেছেন অনিমেষ রায়, আর লক্ষ্য করেছেন বাসন্তী সম্পর্কে অশোকের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। বাসন্তী অশোকের কাছে কোনো আকর্ষণ নয়। কিন্তু বাসন্তী অশোকদার এতটুকু হাসির প্রসাদ পেলে যেন ধন্য হয়ে যাবে। রোমিও-র প্রেমে জুলিয়েট-ও সম্ভবত অতটা আত্মহারা হয় নি, এইরকম ধারণা অনিমেষ রায়ের। নিতান্তই অপাত্রে হৃদয় দিয়ে ফেলেছে অথবা দেবার উপক্রম করেছে বাসন্তী মিত্র, অশোক কাঞ্জিলালের জন্যে ওর এই হ্যাংলাপনাকে শোচনীয় ট্রাজেডি বলে মনে হয়েছে অনিমেষ রায়ের। বাসন্তী মিত্রের ভেতর একটু অসাধারণত্বের আভাস অনুভব করেছেন তিনি। এখনো নারীরত্ন হয়তো হয়ে ওঠে নি, কিন্তু হয়ে ওঠবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এই সুশ্রী, বুদ্ধিমতী, সুশীলা, সুস্মিতা মেয়েটির মধ্যে। যাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেলে ধন্য হবে অশোক কাঞ্জিলাল, সেই বাসন্তী যেন ভিখারিনীর মত হাত পেতেছে অশোকের সামনে নতজানু হয়ে, কিন্তু তার দিকে তাকিয়েও দেখতে রাজি হচ্ছে না অশোক কাঞ্জিলাল। আলেয়াকে আলো ভেবে তারি পেছনে ছুটছে মেয়েটা ; অথবা হয়তো ছুটছে আগুনের পেছনে, বুঝতে পারছে না এ আগুন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে।

প্রথম প্রথম অনিমেষ রায়ের মনে হয়েছিল বাসন্তী মেয়েটি সাংসারিক বুদ্ধিতে খুব পাকা, তাই বড়লোক বাপের ভাবী উত্তরাধিকারী অশোক কাঞ্জিলালকে বাগাবার চেষ্টা করছে ঐশ্বর্যবতী হবার লোভে। কিন্তু পরে তাঁর ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু বোঝা নয়, গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন বাসন্তীর লোভ অশোকেরই ওপর, অশোকের ঐশ্বর্যের ওপর নয়, ঐশ্বর্য আর অশোক এই দুয়ের একটিকে বেছে নিতে হলে, ঐশ্বর্য ছেড়ে অশোককেই বেছে নেবে বাসন্তী। অর্থাৎ সাধারণ চলতি

ভাষায় অশোকের প্রেমে আকণ্ঠ ডুবেছে বাসন্তী মিত্র। একদিন দৈবাৎ একটু সুযোগ পেয়ে অনিমেষ তাকে আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন—এ তার প্রেম নয়, মোহ মাত্র, এবং এই মোহ থেকে যত শীগ্‌গির সে মুক্তি পায় ততই ভাল। সে দিন তাঁর ক্লাস শেষ করে কলেজের লাইব্রেরির এক নিরালা কোণে বসে পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে একখানা সগুপ্রকাশিত গ্রন্থপাঠে মগ্ন ছিলেন অনিমেষ রায়। একটি অধ্যায় শেষ করে পরের অধ্যায় পড়া শুরু করবেন, এমন সময় তাঁর খেয়াল হল, কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে বাসন্তী মিত্র, তিনি বই পড়ছেন বলেই নীরবে অপেক্ষা করছে কথা কইবার একটু সুযোগের জন্য।

'কিছু বলবে, বাসন্তী?' শুধালেন অনিমেষ রায়।

একটু ইতস্তত করল বাসন্তী। বাসন্তীর সংকোচের কারণ অনুভব করে অনিমেষ রায় হাতের বইখানা বন্ধ করে রেখে বললেন, 'এ বই আমার পরে পড়লেও কোনো ক্ষতি হবে না। বলো, তোমার কথা শুনি। বসো এইখানে। না না, দাঁড়িয়ে নয়, বসো।' বাসন্তীকে ও পাশের চেয়ারে বসালেন অনিমেষ রায়।

সে দিনই ক্লাসে দর্শনের একটি গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি। সেই-সংক্রান্ত কয়েকটি নতুন সমস্যার উদয় হয়েছে বাসন্তীর মনে, বাসন্তী তাদেরই সমাধান পেতে এসেছে অনিমেষ রায়ের কাছে।

বাসন্তীর প্রশ্নগুলো শুনে খুশি হলেন অনিমেষ রায়। প্রশ্নগুলো থেকেই পরিষ্কার বুঝলেন ক্লাসে তাঁর বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা খুঁটিয়ে শুনেছে বাসন্তী, এবং তার সারমর্মও তার কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। তা না-হলে এমন গুছিয়ে সে প্রশ্ন করতে পারত না। সাধারণ ক্লাসের ভিড়ে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে না, তাই ক্লাসের ভেতর এ প্রশ্ন না তুলে, ক্লাসের শেষে এককভাবে

আলো পেতে চাইছে বাসন্তী মিত্র। ক্লাসের অন্তত একজনের কানে তাঁর গলাবাজি অরণ্যে রোদন মাত্র হয় নি, সেই একজন বাসন্তী মিত্র! বিস্মিত হলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়; এতটা গভীরতা তিনি বাসন্তীব ভেতরে আশা করেন নি।

সবচেয়ে বেশি বিস্ময়েব কথা এই যে, সে দিন ক্লাসে যে আলোচনা কবেছিলেন, সেটা এসে পড়েছিল প্রসঙ্গক্রমে, পরীক্ষার পাঠক্রম বা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয় সেটা। তবু সে বিষয়ে আরো জ্ঞানলাভের স্পৃহা বা কৌতূহল জেগেছে বাসন্তী মিত্রের মনে! ভাবলেন হয়তো ভুল বুঝেছে মেয়েটা, ভেবেছে পরীক্ষার জন্যে এ প্রসঙ্গটা বোধহয় খুব দামী, এটা ভাল কবে বপ্ত করে রাখলে পরীক্ষায় নিশ্চয় ভাল নম্বর পাওয়া যাবে। ভুল ভেঙে দেবার জন্যে তিনি বললেন, 'এ জিনিস তো পবীক্ষায় আসবে না, বাসন্তী। এ নিয়ে অনর্থক কেন মাথা ঘামাবে?'

কিন্তু না, অনর্থক নয়। চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে বাসন্তীর। বিশ্বময় অকল্যাণ-সমস্যা এত প্রবল কেন, ঈশ্বব যদি পরম করুণাময় হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর তৈবী পৃথিবীতে কেন এত দুঃখ, অন্যায়, অবিচার, পাপ? কেন মানুষেব জীবনে এত ট্রাজেডি? মর্মান্তিক জিজ্ঞাসা জেগেছে বাসন্তীর জীবনে, তাই সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে দর্শনের অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের কাছে।

বাসন্তীব ঐকান্তিক আগ্রহ এড়াতে পাবলেন না, এড়াতে চাইলেন না অনিমেষ রায়। ক্লাসে যে কথাগুলো খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন সেগুলোই আরো সবিস্তারে ব্যাখ্যা কবে বোঝালেন বাসন্তীকে, শুধু তাঁর পুঁথি-পড়া বিদ্যা থেকে নয়, নিজের স্বাধীন চিন্তাধারা এবং জীবনের উপলব্ধি থেকে। বাসন্তীর মুখেব ভাব দেখে তিনি অনুভব করতে পারলেন বাসন্তীর মন অনেকখানি তৃপ্তি পেয়েছে।

আলোচনার শেষে অনেকটা তৃপ্ত বাসন্তী ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার উপক্রম করতেই অনিমেষ রায় বললেন, 'বোসো বাসন্তী, চলে যেও না, কথা আছে। তোমারি সম্বন্ধে, এবং তোমারি কল্যাণের জন্যে।'

বাসন্তী উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, অনিমেষ রায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল, দু চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে। দু চোখে শুধু জিজ্ঞাসা নয়, বিব্রত উদ্বেগের ভাবও বটে।

'সাধারণভাবে কল্যাণ আর অকল্যাণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম এতক্ষণ,' বললেন অনিমেষ রায়। 'এবার তোমার ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে চাই, যা আমাকে একটু চিন্তান্বিত করে তুলেছে।'

'বলুন,' শুষ্ককণ্ঠে বলল বাসন্তী মিত্র। এ যেন নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই অধ্যাপককে অনুমতি দেওয়া।

'আশা করি, আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না, বাসন্তী।' বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'কিছু দিন ধরে তোমাকে সাবধান করে দেবো ভাবছি, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠে নি, মানে ঠিক উপযুক্ত সময় আর সুযোগ পাই নি। আজ—আজ—'

'সেই সুযোগ পেয়েছেন?' প্রশ্ন করল বাসন্তী মিত্র। অনিমেষ রায়ের মনে হল সেই প্রশ্নের সুরে মিশে আছে রুক্ষতা, রূঢ়তা, আর কিঞ্চিৎ শ্লেষের আভাস।

'পেয়েছি,' বললেন দর্শনের অধ্যাপক অনিমেষ রায়। বাসন্তী মিত্র রাগ করে করবে, তাঁকে প্রকারান্তরে অসম্মান করবে, সে ঝুঁকি নিয়েও বাসন্তীকে তিনি সাবধানবাণী শোনাবেনই, নইলে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে তাঁকে।

'পেয়েছি তোমাকে সাবধান করে দেবার সুযোগ,' বললেন

অনিমেষ রায়। 'যার সঙ্গ তোমার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত, ঠিক তারই সঙ্গ তুমি খুঁজে বেড়াও।'

'কার কথা বলছেন আপনি?'

'তা কি তুমি বুঝতে পারো নি, বাসন্তী? অশোক কাঞ্জিলালের কথা বলছি আমি। তোমার মত ভাল মেয়ে, যে একটু নিয়মিত পড়াশোনা করলেই পরীক্ষায় খুব ভাল করতে পারবে, সে কেন ছুটবে ওর মত একটি ভ্যাগাবণ্ড ছেলের সঙ্গে, যে চার বছর ধরে একই ক্লাসে আটকে রয়েছে, আব থাকবেও অনেক বছর? যে ছেলের কোনো কাল্‌চার নেই, আছে শুধু বাপের প্রচুর টাকা?'

কথাগুলো বলেই নিজেরই একটু খারাপ লাগতে লাগল অধ্যাপক অনিমেস রায়ের। কারণ বাসন্তী মিত্র যেমন তাঁব ছাত্রী হিসেবে স্নেহের পাত্রী, অশোক কাঞ্জিলালও তো ঠিক তেমনি ছাত্র হিসেবে তাঁর স্নেহের পাত্র।

'আপনি অশোকদাব ওপব এমন বিরূপ কেন? তিনি তো আপনার কোনো ক্ষতি করেন নি।' বলল বাসন্তী মিত্র।

অনিমেষ রায় স্পষ্ট অনুভব করলেন কি-একটা কড়া কথা শোনাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কথা চেপে দিয়ে এই কথাটা শোনাল বাসন্তী।

অনিমেষ রায় বললেন, 'না, আমার কোনো ক্ষতি সে করে নি। হয়তো করবেও না কখনো, কারণ তার প্রয়োজন বা সুযোগ হবে না। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার ক্ষতির কথা।'

'আমার ক্ষতির কথা আমি নিজেই ভাবতে পারব,' বলল বাসন্তী। 'আর, অশোকদা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেন, সে কথা আর যে-কেউ ভাবতে পারুক, আমি পারি নে। অশোকদা কারও ক্ষতি করতে পারেন, এ কথাই আমি বিশ্বাস করি নে।'

অনিমেষ রায় বললেন, 'তা যে করো না, তাতে আমারও কোনো

সন্দেহ নেই, বাসন্তী। আর নেই বলেই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমি দরকার মনে করেছি।'

'ধন্যবাদ,' বলল বাসন্তী। কথাটা ভাল, কিন্তু উচ্চারণের ভঙ্গিতে আর ধ্বনিতে রয়েছে মৃদু শ্লেষের আভাস। সে আভাস গায়ে মাখলেন না অনিমেষ রায়। বাসন্তীর দিক থেকে যত রকম রূঢ়তা আসুক না কেন, তা গায়ে মাখবেন না কিছুতেই, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। তাঁর মনে হল বাসন্তী মিত্র কবিগুরুর একটি কবিতার নায়িকার মত ভাবছে :

'(আমি) আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।'

অশোক কাঞ্জিলালের প্রেমে আকণ্ঠ ডুবেছে বাসন্তী, অশোকের বিরূপ সমালোচনা করে সেই প্রেমের অপমান করেছেন তিনি। তাই বাসন্তী রাগ করেছে তাঁর ওপর।

'আমি লক্ষ্য করেছি, বাসন্তী, অশোক কাঞ্জিলালের জন্যে তোমার ব্যাকুলতা, আর তোমার প্রতি তার নিরবচ্ছিন্ন উদাসীনতা, অবহেলা, উপেক্ষা,' বললেন অনিমেষ রায়। 'তোমার আত্মমর্যাদাকে মাড়িয়ে চলেছে অর্থগর্বী ধনীর দুলাল।'

বাসন্তী বলল, 'কলেজে তো আরো অনেক মেয়ে আছে। তবে আমারই ওপর আপনার এত নজর কেন?'

এবারও চটলেন না অনিমেষ রায়। অবিচলিত ধীর কণ্ঠে বললেন, 'কারণ কলেজে অনেক মেয়ে থাকলেও বাসন্তী মিত্র একটিই আছে, এবং একমাত্র সেই মেয়েটিই ধনীদুলাল অশোক কাঞ্জিলালের উপেক্ষার পর উপেক্ষা অনায়াসে সহ্য করে তারি পিছনে ছুটছে।'

নির্মম, রূঢ়, অপ্রিয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

বাসন্তীর ভেতরে অনিমেষ রায় যেন একই সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন হিমানীর অতীত আর বীতার ভবিষ্যৎ। তাই বাসন্তীর প্রতি

অসীম স্নেহে সিক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। তাই তাব ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মেয়েটা তাব নিজেব ভুলে পবে দুঃখ পেলে বড় দুঃখ পাবেন তিনি, এইটে হযতো বুঝতে পাবছে না বাসন্তী।

'অশোকদাব বাবাব অনেক টাকা, সেটা কি অশোকদাব অপবাধ?' শুধাল বাসন্তী।

অনিমেষ বায় বললেন, 'অপবাধ নয, অভিশাপ বলতে পাবো। যাব মগজ শূন্য, শয়তানেব কাবখানা, তাব হাতে অজস্র টাকা হচ্ছে জাহান্নামেব সোজা বাস্তা। তাই তোমাকে সাবধান কবছি।'

আত্মমর্যাদায ঘা লাগল বাসন্তীব। সে বলল, 'আপনি ভুল কবছেন। অশোকদাব টাকাব ওপব আমাব কিছুমাত্র লোভ নেই। আমাব ভাল লাগে অশোকদাকে, তাঁব টাকাকে নয।' একটু থেমে তাবপব আবাব বলল, 'তাঁব টাকা না থাকলেই আমি খুশি হতাম।'

অনিমেষ বায বললেন, 'নিজেব মনটা শস্তা জিনিস নয, বাসন্তী, ও নিযে ছেলেখেলা কবো না। আগুন নিয়ে খেলা কবতে যাওয়াটাও বিপজ্জনক, এ কথাটাও মনে বেখো। বেনা-বনে মুক্তোও ছড়াতে নেই।'

বিদায় নিযে যখন চলে গেল বাসন্তী মিত্র, তখন অনিমেষ বায়েব মনে হল না অশোক কাঞ্জিলাল সম্পর্কে হুঁশিয়াবি বাসন্তীর মনে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তাব কবেছে। তবু মনে মনে অন্তত এটুকু তৃপ্তি তিনি পেলেন যে, তাঁব দিক থেকে যেটুকু কববাব তা তিনি কবেছেন, তাতে ফল না-হলে কী কবতে পাবেন তিনি? তাঁব মনে হল মেয়েদের হৃদয়েব ব্যাপাব কোনো লজিক বা যুক্তি মানে না। তিনি যুক্তি দিয়ে বাসন্তীকে বোঝাতে গিয়েছিলেন তাব মত মেয়ের হৃদয় অশোক কাঞ্জিলালের মত অপাত্রে সমর্পিত হওয়া উচিত নয়;

ঐখানেই তাঁর ভুল হয়েছিল। তাছাড়া, বাসন্তী যে চোখে দেখেছে অশোককে, সে চোখ তো তাঁর নেই।

একবার মনে মনে কো-এডুকেশন অর্থাৎ সহশিক্ষার ওপর চটে উঠলেন অনিমেষ রায়। কিন্তু তা সাময়িক। কারণ পরেই তাঁর মনে হল শিক্ষার আওতার বাইরেও তো এইজাতীয় ব্যাপার অনেক হচ্ছে।

সে দিনই সন্ধ্যাব পর বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ অনিমেষ বায়েব মনে হল কাফে-ডি-কলেজে একদিনও ঢুকে দেখেন নি, শুধু শুনেছেন রাজমোহিনী কলেজেব ছাত্রছাত্রীদেব অতি প্রিয় মিলনতীর্থ এটি; শুধু তাই নয়, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এখানে এসে আড্ডা জমাতে ভালবাসে। কাফে-ডি-কলেজেব কলেজ-চপ এবং কলেজ-কাটলেট অতিশয় বিখ্যাত; এ দুটিই বানাবাব কায়দা এবং মালমসলাব হিসেব নাকি মালিক কালোবরণ মাইতি ওরফে কালোবাবুব একান্ত গোপনীয় পরম সম্পদ, 'ট্রেড-সিক্রেট'। কলকাতাব বড় বড় হোটেলের বাবুর্চি-বিভাগ মোটা টাকা দিয়ে কালোবাবুর এই ট্রেড-সিক্রেট শিখে নেবাব বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু কালোবাবু এই সিক্রেট কিছুতেই বেচতে রাজি হন নি; ফলে অতুলনীয় কলেজ-চপ এবং কলেজ-কাটলেট খেতে হলে কাফে-ডি-কলেজের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এইজাতীয় প্রোপাগাণ্ডা চার ধারে ছড়ান আছে, এবং ছড়াবার পিছনে কালোবাবুব নেপথ্য কেরামতি থাকা অসম্ভব নয়।

এই কাফে-ডি-কালেজে বাসন্তী অনেক এসেছে, অশোক কাঞ্জিলালেব সঙ্গে একই সময়ে। কৌতূহল হল অনিমেষ রায়ের। ঢুকে পড়লেন তিনি। ঢুকেই যে অভ্যর্থনা পেলেন, তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। একজন ছোটখাটো গোলগাল চেহারার

ভদ্রলোক অত্যন্ত সমীহ করে জোড়হাতে বললেন, 'আসুন স্যার, আজ আমার কাফে-ডি-কলেজের বড় সৌভাগ্য।'

অনিমেষ রায় বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, 'আপনিই কালোবাবু? কালোবরণ মাইতি?'

গোলগাল কাল ভদ্রলোকটি বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, অধীনেরই নাম কালোবরণ মাইতি। চেনেন দেখছি।'

'চিনলাম আজ। নাম শুনেছি আগে,' বললেন অনিমেষ রায়। 'কিন্তু আমায় আপনি চিনলেন কি করে?'

কালোবাবু সবিনয়ে বললেন, 'বাঃ, আপনাকে এ পাড়ায় কে না চেনে বলুন? ফেলোজফির প্রফেসর অনিমেষ রায় মহাশয়কে কে না জানে? আপনাকে রোজ কলেজে যেতে আসতে দেখি যে। আপনার ছাত্রছাত্রীরা, স্যার, আপনার কথায় পঞ্চমুখ। আপনার মত স্যার নাকি আর হয় না। ভারি চমৎকার গপ্পো বলেন নাকি আপনি।'

অনিমেষ রায় শুনেছিলেন আশ্চর্য রকম বাচাল কাফে-ডি-কলেজের মালিক কালোবাবু। কিন্তু ভদ্রলোক যে এতটা বাচাল হবেন তা তিনি আশা করতে পারেন নি। যাহোক, এই বাচালতায় তিনি খুশিই হলেন।

'অনেক প্রফেসার-ই এখানে পায়ের ধুলো দেন, শুধু আপনার পায়ের ধুলোই পড়ে নি,' বললেন কালোবাবু। 'ইচ্ছে করেছি অনেক দিন। সেই ইচ্ছের জের যাবে কোথায়? তাছাড়া কলেজ-চপ আর কলেজ-কাটলেট টেস্ট করেন নি আশঙ্কা করি।'

'না, করি নি।'

'রাজমোহিনী কলেজে আপনিই শুধু বাকি,' বললেন কালোবরণ মাইতি। 'বাইরে বসবেন, না চেম্বারের ভেতরে বসবেন? ভেতরেই ভাল। যদি ছাত্রছাত্রী কেউ এসে পড়ে, বলা তো যায় না, আপনি হয়তো একটু যাকে বলে ইয়ে বোধ করবেন। অনেক

প্রফেসার অবশ্য করেন না, কিন্তু আপনি শুনেছি খুব ভাবিক্কি, একটু আড়াল আর তফাত পছন্দ করেন।'

বলে পর্দা সরিয়ে অনিমেষ রায়কে একটা পার্টিশন-করা ছোট্ট কামরার ভেতর ঢুকিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন কালোবাবু। মাঝখানে একটা টেবিল, দু পাশে দুটো চেয়ার। দু জনে মুখোমুখী বসবার কামরা এটা। কিন্তু অনিমেষ রায় এসেছেন একা, তাঁর মুখোমুখী বসবার কেউ আসে নি সঙ্গে।

'একদিন এখানে আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে, এ আমি জানতাম স্যার,' বললেন কালোবাবু। 'কিন্তু দু জনা কামরা, দু জনা টেবিল, আপনি একা। অবিশ্যি একা এসেছেন, একাই যেতে হবে; আপনি ফেলোজপি পড়ান, আপনাকে আর কী বলব? কিন্তু খাওয়া বলুন, আড্ডা বলুন, একা জমে কি?'

অনিমেষ রায় সঙ্গী-ই চান, আর এই কালোবাবুকেই। বললেন, 'জমে না। তাই আপনার সঙ্গ কামনা করি,' বলে উল্টো দিকের চেয়ারে কালোবাবুকে বসবার ইশারা করে বললেন, 'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে।'

কালোবাবু বললেন, 'আর কোনো অসুবিধে তো নয়, তবে কিনা, ক্যাশে বসিয়েছি মেজো শালাকে। ও শালার চক্ষুলজ্জা বলে কোনো পদার্থ নেই। আমি যা খাবো তার জন্যেও পুরো দাম আদায় করবে, একটি নয়াপয়সা কনশেসন করবে না।'

অনিমেষ রায় বললেন, 'দরকার নেই কনশেসনের। দু জনের পুরো টাকাই আমি দেবো। আসুন আপনি।'

'তা যখন বলছেন, তখন বসছি স্যার, আপনার সঙ্গে,' বললেন কালোবরণ মাইতি। 'তবে কিনা, আজকাল আর তেমন খেতে পারি নে, শুধু আপনাকে একটু সঙ্গ দেওয়া আর কি,' বলে সঙ্গ দিতে বসলেন।

খাওয়াটা উদ্দেশ্য নয় অনিমেষ রায়ের, অজুহাত বা উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি এসেছেন কাফে-ডি-কলেজের পরিবেশ আর আবহাওয়া অনুভব করে যেতে। এ আবহাওয়া অথবা এজাতীয় আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত নন তিনি। তার ওপর তিনি যেন জল চাইতে-না-চাইতেই পেয়ে গেলেন শরবত। অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলেন কাফে-ডি-কলেজের বাচাল মালিক কালোবাবুর একান্ত সঙ্গ, যাঁর মুখের গেজেট থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে।

কালোবাবু ডাকলেন, 'মান্‌কে!'

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ফাঁক করে কামরার ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল কাফে-ডি-কলেজের অন্যতম 'বয়' মানিকচাঁদ। বলল, 'আজ্ঞে?'

টেবিলের ওপর 'মেনু' ছিল। তাই দেখিয়ে কালোবাবু বললেন, 'ফরমায়েশ করুন, স্যার।'

অনিমেষ রায় রেস্তোরাঁয় খেতে অভ্যস্ত নন, মেনু-টেনু বোঝেন না। বললেন, 'আপনার যা পছন্দ হয়, দিন ফরমায়েশ করে।'

'তাহলে দুখানা করে কলেজ-কাটলেট আর চারখানা করে কলেজ-চপ দিয়ে যা, মান্‌কে,' বললেন কালোবাবু। 'নতুন গরম গরম চাই, টাটকা বানান। আর শোন্, দুর্গাপদকে বলবি চপে আর কাটলেটে পাঁচ নম্বর গুঁড়ো মশলাটা যেন এক চামচ বেশি দেয়। আজ স্যার খাবেন, একটু স্পেশাল চাই।'

মান্‌কে চলে গেল। অনিমেষ রায়ের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে কালোবাবু বললেন—আশ্চর্য! ভদ্রলোক কি মনের প্রশ্ন মুখে পড়তে পারেন?—"দুর্গাপদ আমার কাফে-ডি-কলেজের কিচেন-ইন-চার্জ, যাকে বলে, রসুই-বিভাগের সভাপতি। ওর আণ্ডারে সাত

জন কারিগর কাজ করে। আমার আপন হাতে তৈরি দুর্গাপদ। ইংরিজি খানা বলুন, মোগলাই খানা বলুন, দিশি খানা বলুন, সবরকম ওকে হাতে ধরে শিখিয়েছি। এককালে—মানে সাতটি বছর—বাবুর্চিগিরি করেছি কি-না, সব আমার নখদর্পণে। ভুঁইফোঁড়ের মত বলা নেই কওয়া নেই, অমনি ঝপাং করে কাফে-ডি-কলেজ খুলে বসি নি। মনে করুন—ভগবান না করুন—আজ যদি আমার সাত জন কারিগর, মায় দুর্গাপদ পর্যন্ত, ধর্মঘট করে হাত গুটিয়ে বসে তো কুছ-পরোয়া নেই, জলে পড়বো না আমি, কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাবো রসুইখানায়। ~~ক্যাশে মেজো~~ শালাকে বসিয়েছি, এ দিকটার জন্যে তো আর ভাবনা নেই। ছেলেপুলে দেন নি ভগবান, আশাও ছেড়ে দিয়েছি, আমার যাকিছু ঐ মেজো শালাই পাবে। আর ঐ-যে পাঁচ নম্বর গুঁড়ো মশলাটা এক চামচ বেশি করে মেশাতে বললাম শুনলেন না ? ঐ নম্বরী গুঁড়োগুলোই হল আমার ট্রেড-সিক্রেট ; ওগুলো আমি আপন হাতে গোপনে তৈরি করি। ওদের ফরমুলা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না—যাবার আগে শুধু মেজো শালাকে শিখিয়ে দিয়ে যাবো।”

বলতে বলতে কলেজ-চপ আর কলেজ-কাটলেট এসে গেল। বেশ চটপটে বয় মানিকচাঁদ, আর রসুই-বিভাগও খুব তৎপর, ভাবলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। প্লেট, কাঁটা, চামচ, ছুরি প্রভৃতি যাকিছু সাজাবার নিখুঁত করে সাজিয়ে দিয়ে মানিকচাঁদ আরো আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

‘চা, না কফি, না কোকো ? কোন্‌টা পছন্দ করেন আপনি ? শুকনোর ফাঁকে ফাঁকে একটু গলা ভেজাতে হবে তো ?’ শুধালেন কালোবাবু।

‘আপনি কী পছন্দ করেন ?’ প্রশ্ন করলেন অনিমেষ রায়। ‘আজ আপনি আমার গেস্ট।’

'অর্থাৎ কিনা অতিথি,' বলে খুশির হাসি হাসলেন কালোবরণ মাইতি। 'এ আমার কত বড় সৌভাগ্য স্যার, বলতে পারি নে। আপনার পাশে বসবার যুগ্যি নই, কিন্তু আপনি গেস্ট বলছেন আমাকে। তাহলে চা-ই নিয়ে আয়, মান্‌কে। কফি আর কোকো তো গোঁজামিল দিয়ে সব রেস্তোরাঁই চালায়, বিপ্ত্বে ধরা পড়ে চায়ের বেলায়। লিকার, দুধ, চিনি একটু ইদিক-ওদিক হয়েছে কি, ফ্লেভার অর্থাৎ কিনা তারের বারোটা বেজে গেল। চা তো অন্য অনেক জায়গাতেও খান, আজ আমার কাফে-ডি-কলেজেও খেয়ে দেখুন, তারপর বলুন, আসমান-জমিন ফারাক কি-না। যা মান্‌কে, ট্রেতে সব সাজিয়ে নিয়ে আয়, আমি স্যাবকে চা বানিয়ে দেবো। দাঁড়া। কলা স্যার আপনি কোন্‌টা পছন্দ করেন? মর্তমান, না সিঙ্গেপুরী? হ্যাঁ, কলা খাবেন বইকি। চায়েব সঙ্গে খাসা জমে। সিঙ্গেপুরীই আনতে বলি? তাই নিয়ে আয় মান্‌কে।'

মান্‌কে চলে গেল চায়েব সরঞ্জাম আব সিঙ্গাপুবী কলা আনতে। কালোবাবু বললেন, 'সিঙ্গেপুবী কলাদেব মজাই হচ্ছে স্যার, ওরা সবাই আজকালকার কলেজী পড়ুয়াদেব মত।'

কালোবাবুব আগেকাব বক্‌বকানি সহ্য করেছিলেন অনিমেষ রায়, কালোবাবুর সর্বশেষ এই কথাটা উপভোগ করে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'কী রকম?'

কালোবাবু বললেন, 'মানে, বাইরের চেহারায় কাঁচা, ভেতরে পাকা।'

'উপমা কালিদাসস্য।' ভাবলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

'হ্যাঁ, বলছিলাম কি, অনেক প্রফেসারই এখানে পায়ের ধুলো দেন। সবাই স্নেহ করেন আমাকে,' বললেন কালোবরণ মাইতি। 'কিন্তু আপনার মত এমনি করে কেউ আমাকে ডেকে পাশে বসান নি। ঐখানেই তো ওনাদের সঙ্গে আপনার তফাত। তাই তো

আপনার পড়ুয়ারাও আপনাকে খুব—বুদ্ধি করে কেকও নিয়ে এসেছিস দেখছি—মান্‌কে। বেশ করেছিস। কেকের কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।'

সত্যিই, দেখলেন অনিমেষ রায়, মানিকচাঁদ ট্রের ওপর সাজিয়ে এনেছে চায়ের সরঞ্জাম, এক ডজন সিঙ্গাপুরী কলা আর তার সঙ্গে এনেছে একগাদা রকমারি কেক।

'বয়' মানিকচাঁদ অসাধারণ সাধুপ্রকৃতির মানুষ। সে বলল, 'বুদ্ধিটা আমি করি নি আজ্ঞে। মামাবাবুই পাঠিয়ে দিলেন,' বলে চলে গেল।

চা বানাতে বানাতে কালোবাবু বললেন, 'চিনি ক চামচ খান স্যার? থাক্ থাক্, বলবেন না স্যার। আমাব ওপব ছেড়ে দিন আপনি। আপনাকে দেখেই আমি ঠিক যা বুঝবার বুঝে নিয়েছি। এই নিন। দেখুন খেয়ে।'

চায়ের পেয়ালা অনিমেষ রায়ের দিকে এগিয়ে দিলেন, কালোবাবু, আর তাঁব মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন অধ্যাপক অনিমেষ। বললেন, 'চিনি একটু কম হয়েছে, কালোবাবু। আরেক চামচ দিন।'

'ঠিক জানতাম দু চামচের কমে আপনার চলবে না,' বললেন কালোবাবু। 'তবু একবার বাজিয়ে নিলাম। সাবধানের মার নেই। বুঝলেন না?' বলে আরেক চামচ চিনি দিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের চায়ের পেয়ালায়।

কলেজ-চপ খেয়ে দেখলেন অনিমেষ রায়, খেয়ে দেখলেন কলেজ-কাটলেট। ভাল লাগল তাঁর। চা-ও ভাল লাগল। এ তিনি আশা করেন নি, বরং ভাল লাগবে না বলেই আশঙ্কা করেছিলেন। কালোবাব সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন

হল। চেহারায় আর কথাবার্তায় প্রায় ভাঁড়োচিত হলেও কালোবাবুকে ভাঁড় বলে ভাবতে পারলেন না অনিমেষ রায়। বললেন, 'আপনার এখানে কিছুক্ষণ বসা যাবে তো?'

কালোবাবু তখন কলেজ-কাটলেট চিবোচ্ছিলেন। চিবোনো শেষ করেই বললেন, 'বিলক্ষণ। আপনি কতক্ষণ বসবেন, বসুন না। সে তো কাফে-ডি-কলেজের মহা সৌভাগ্য, স্যার।'

'আপনার কোনো তাড়া নেই?'

'আজ্ঞে স্যার, তাড়া তো আপনাদের। আমরা তো হলেম গিয়ে কীটস্য কীট। আমাদের আবার তাড়া কিসের? কেক একখানা খেয়ে দেখুন স্যার, আমার কাফে-ডি-কলেজের জন্যে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি।'

কেকও ভাল, খেয়ে দেখলেন অনিমেষ রায়। তাঁর মনে হল এতক্ষণ এই লোকটিকে মনে মনে অকারণ অবহেলা করেছেন তিনি, অন্যায়ভাবে। লোকটির রেস্তোর্াঁয় খাদ্য এবং পানীয়, দুই-ই তো বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। আগে ভুল ধারণা করে যে অন্যায় করেছেন, সেটা শোধরাবার জন্য অনিমেষ রায় বললেন, 'কলেজের পড়ুয়ারা বুঝি আপনার কলেজ-চপ আর কলেজ-কাটলেট খুবই পছন্দ করে?'

কালোবাবু ততক্ষণে তাঁর চতুর্থ চপটি খাওয়া শেষ করে আরেকটি তুলতে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'আজ্ঞে, শুধু চপ আর কাটলেট কেন, কাফে-ডি-কলেজের সবকিছুই ওঁদের ভয়ানক পছন্দ। মায় এই কালোবরণ মাইতি। কালোবাবু বলতে সবাই একবাক্যে অজ্ঞান—ছাত্রই বলুন, আর ছাত্রীই বলুন। জিজ্ঞেস করে দেখবেন অশোক কাঞ্জিলাল বাবুকে, আর ঐ যাঁর নাম বাসন্তী মিত্তির—'

আশ্চর্য! এদের কথাই শুনতে চান অধ্যাপক অনিমেষ রায়, আর ঠিক এদের কথাই প্রসঙ্গক্রমে দৈবাৎ এসে পড়ল কালোবাবুর মুখে।' এই অপ্রত্যাশিত পরম সুযোগ ছেড়ে দিলেন না অনিমেষ

রায়। শুধালেন, 'এরা দু জন আপনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নাকি ?' একটু কৌতুকের সুর আনবার চেষ্টা করলেন তিনি, কৌতূহলের উদগ্রতা লুকোবার জন্য।

কালোবাবু বললেন, 'অশোকবাবু তো ক বছর ধরেই ছাত্রদের সর্দার। আর ছাত্রীদের ভেতর এই সে দিন এসেই বাজিমাৎ করেছেন বাসন্তী মিত্তির। এই দেখুন আমার কাণ্ড। মার কাছে বলছি মাসির খবর। আপনি তো স্যার সবই জানেন। তবে কি-না, একটা কথা হয়তো আপনি জানেন না, ওদের দু জনের ভেতর বোধকরি ভেতরে ভেতরে একটা ইয়ে চলছে।'

'প্রেম ?' শুধালেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। ভুলে গেলেন নিজের অধ্যাপকত্ব।

কথাটা কিভাবে বোঝান যাবে সেই চিন্তা করে কালোবাবু বললেন, 'একতরফা। সেইটেই তো দুঃখ। বাসন্তী মিত্তির ফ্যাল্না নন, এইটে বুঝছেন না অশোক কাঞ্জিলাল বাবু। বুঝবেনও না, অথচ তিনি যে বুঝবেন না এটাও বুঝতে চাইছেন না বাসন্তী মিত্তির। যাক্ গে, ওসব জাহাজের খবরে আমার মত আদার ব্যাপারীর কী দরকার ? কিন্তু আপনি অত কম খেলে আমি যে লজ্জা পাবো, স্যার।'

অনিমেষ রায় বললেন, 'না না, লজ্জা পাবেন না, কালোবাবু। খাওয়ার চাইতে আমি খাওয়াতে ঢের বেশি ভালবাসি।'

'তাহলে অবিশ্যি আলাদা কথা। তাহলে আর লজ্জা করব না,' বললেন কালোবরণ মাইতি এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত আরো তৎপর হয়ে উঠল।

আজ কাফে-ডি-কলেজে তাঁর অন্তত টাকা-দশেক খসবে বলে সন্দেহ হল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের; কিন্তু তা হক, তাতে তাঁর দুঃখ নেই। তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না আজ তাঁর হঠাৎ

কাফে-অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবার ঐকান্তিক লোভ কেন জেগেছে মনে। দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে তিনি এত দিন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন শামুকের মত গুটিয়ে, পরিচিত হতে চেষ্টা করেন নি জগতের সাধারণ মানুষের বহুবিচিত্র সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর কোন্ মন্ত্রবলে কাফে-ডি-কলেজ তাঁকে ভেতরে টেনে নিয়েছে ?

নিজের মনকে একটু বিশ্লেষণ করলেই তিনি বুঝতে পারতেন এর মূলে বাসন্তী মিত্র আর অশোক কাঞ্জিলাল। কাফে-ডি-কলেজ অশোকের প্রিয় আড্ডা, আর বাসন্তী মিত্র এখানে আসে অশোকেরই আকর্ষণে।

'অশোক ছেলেটিকে কেমন মনে হয় আপনার ?' শুধালেন অনিমেষ রায়, কলেজ-কাটলেট খেতে খেতে।

'ভাল। খুব ভাল,' বললেন কালোবরণ মাইতি। 'মন তো নয়, যেন সোনা দিয়ে গড়া। তবে কিনা বড্ড বেশি নরম, যাকে আপনারা বলেন সেন্টিমেন্টাল। প্রায় মাথা-খারাপের কাছাকাছি। ওর কথা ভাবলে আমার মাঝে মাঝে মন-খারাপ হয়ে যায়, স্যার।'

অশোক কাঞ্জিলালের চরিত্রের ওপর যেন নতুন আলোকপাতের ইঙ্গিত পেলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। তবু প্রশ্ন করলেন না আর। বুঝলেন, কালোবাবু বিনা প্রশ্নেই আরো কিছু শোনাবেন অশোক সম্বন্ধে।

অনিমেষ রায়ের অনুমান মিথ্যে হল না। কালোবাবু বলতে লাগলেন, 'জানি নে মার কাছে মাসির খবর শোনাচ্ছি কি-না। তবে কি-না, শুনেছি সাতে পাঁচে বেশি মাথা ঘামান না আপনি, পড়া আর পড়ান নিয়ে মশগুল। খাঁটি প্রফেসারদের যা তপস্যা। যা বলব, সেসব হয়তো আপনার নজরে বা খেয়ালে আসে নি। এই

অশোক কাঞ্জিলাল দেখবেন বি.এ. পাসও করবেন না, কলেজও ছাড়বেন না—অন্তত আর কয়েক বছরের ভেতর তো নয়ই।'

'কেন?'

'ওঁর মনটাকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে গেছেন মঞ্জরী চাটুজ্জে,' বললেন কালোবরণ মাইতি। 'রাজমোহিনী কলেজেরি ছাত্রী; আপনার ক্লাসে পড়েন নি, তাই আপনি দেখেন নি, অথবা দেখে থাকলেও খেয়াল করেন নি। অবিশ্যি চোখে পড়বার মত মেয়েও ছিলেন না মঞ্জরী চাটুজ্জে। কিন্তু স্যার, কি বলব আপনাকে, এরি জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন অশোক কাঞ্জিলাল—উঠতে মঞ্জরী, বসতে মঞ্জরী, মঞ্জরী বলতে একেবারে অজ্ঞান। মঞ্জরী চাটুজ্জেও অশোকদা বলতে অজ্ঞান। আমার এই কাফে-ডি-কলেজে কত যে ঘন ঘন আসতেন আর খানাপিনা করতেন ওঁরা দু জনে, তার লেখাজোখা নেই! আমরা—যারা ভেতরেব খবর রাখতুম—জানতুম শীগ্‌গিরই ওঁদের বিয়ে হবে। হতও তাই। কিন্তু হতে-হতে হল না। ভেঙে দিলেন অশোক কাঞ্জিলাল।'

'কেন?'

'হঠাৎ ওঁর মনে প্রশ্ন জাগল: মঞ্জরী কি আমার জন্যেই আমার গলায় মালা পরাতে চাইছে, না, মস্ত বড়লোক বাপের আধা-সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী বলে? পরীক্ষা করে দেখলেন ঐ উত্তরাধিকার বাদ দিয়ে শুধু অশোক কাঞ্জিলালকে বিয়ে করতে রাজি নন মঞ্জরী চাটুজ্জে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবন থেকে একেবারে ছেঁটে ফেললেন মঞ্জরী চাটুজ্জেকে। বাপের উত্তরাধিকার ছেড়ে দেওয়াটা স্রেফ ভাঁওতা, মঞ্জরীকে পরীক্ষা করবার জন্যে। তারপর ভুল বুঝে মঞ্জরী চাটুজ্জের অনেক আফসোস, অনেক মিনতি, অনেক চোখের জল। কিন্তু কিছুতেই একফোঁটা বদলাল না অশোক কাঞ্জিলালের জেদ; তিনি আর মুখদর্শন করলেন না মঞ্জরী চাটুজ্জের। তারপর

হতাশ হয়ে অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলেন মঞ্জরীর বাবা। কিন্তু বিয়েটা ভাল হয় নি ; নানা রকম দুঃখে আছেন মঞ্জরী সান্যাল। আর সেই খবর পেয়ে দুঃখে ভবে আছে অশোক কাঞ্জিলালের মন।'

'বলেন কি কালোবাবু ?'

'উনি সত্যি প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলেন মঞ্জরী চাটুজ্জেকে ; সে প্রাণ আর ফিরিয়ে নিতে পারেন নি। ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল কি-না, তাই। সেন্টিমেণ্টাল ছেলেরা বোধহয় একবার ঢেলে-দেওয়া প্রাণ আর ফিরিয়ে নিতে পারে না, মেয়েরা যা পাবে। কী বলেন আপনি ?'

অনিমেষ রায় বললেন, 'এ বিষয়ে আমাব তেমন এলেম নেই, কালোবাবু।'

কালোবাবু বললেন, 'সেইজন্যেই বাসন্তী মিত্তিবের মত মেয়ে—যাকে দেখে প্রেমে না পড়ে থাকাই বীতিমত শক্ত—এতটুকু নাক পর্যন্ত গলাতে পারছেন না অশোক কাঞ্জিলালেব মনে। পারবেন কি করে ? ওখানে যে জুড়ে বসে আছেন সেই মঞ্জরী চাটুজ্জে, যিনি এখন মঞ্জরী সান্যাল।'

'তাহলে কি বাসন্তী মিত্তিরেব কোনো আশাই নেই ?'

'কোনো আশা নেই, স্যাব,' বললেন কালোবরণ মাইতি। 'মিথ্যে আশায় ছুটছেন বাসন্তী মিত্তির। কিন্তু ওঁব আশাটা যে মিথ্যে, এইটে ওঁকে কিছুতেই বোঝান যাবে না। মেয়েদেব বোঝান যায় না।'

কালোবাবু এমন সুবে কথাটা বললেন, যেন মেয়েদের সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে।

ছুটির দিনে বসন্তপ্রভাতে এইসব পুরোন কথা মনে পড়ছিল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের।

'কী ভাবছ ?' প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক-পত্নী হিমানী রায়।

'আর সাত দিন,' বললেন অনিমেষ রায়।

'সাত দিন কী ?'

'পৃথিবীর আয়ু।'

'তারপর ?'

'ধ্বংস। পৃথিবীর চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না অনন্ত শূন্যে। পৃথিবীর বুকে অনেক বসন্ত এসেছে, অনেক বসন্ত গেছে। এবারের বসন্তই পৃথিবীর শেষ বসন্ত,' বললেন দর্শনের অধ্যাপক অনিমেষ রায়, আর কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করলেন, যে অসংখ্য অণু-পরমাণু দিয়ে এই বিরাট আর বিচিত্র পৃথিবীটা গড়া, তারা সবাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে গেছে অনন্ত শূন্যে। সেই মহাশূন্যে ভাসমান অসংখ্য পরমাণুর ভেতরে রয়েছে সেই পরমাণুরাও, যারা এককালে সমবেতরূপে ছিল অনিমেষ রায়, হিমানী, রীতা, অশোক কাঞ্জিলাল, বাসন্তী মিত্র, কালোবরণ মাইতি, আরো অনেকে—পৃথিবীর সবাই।

এমন সময় রাসুর মা এসে বলল, 'একটা আস্ত গঙ্গার ইলিশ এনেছি, মা। চমৎকার মাছটা। কী দিয়ে রাঁধব বলুন—সর্ষে, না হলুদ-লঙ্কা ?'

'গঙ্গা, ইলিশ, সর্ষে, হলুদ, লঙ্কা—সবকিছুই বাকি পৃথিবীর সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে যাবে,' ভাবলেন অনিমেষ রায়।

হিমানী রায় বললেন, 'দু রকম করেই রাঁধ, রাসুর মা। আজ তো তাড়াহুড়ো নেই। বাবুর কলেজ বন্ধ, দিদিমণিও স্কুলে যাবে না।'

খুশি হয়ে রাঁধতে চলে গেল রাসুর মা। বাজার কর্মে এবং রন্ধনকর্মে তার আলস্য নেই, এবং দুটোতেই সে যথাসম্ভব বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী।

রীতার কী মনে হল হঠাৎ, বলল, 'যাই একবার উজ্জ্বলদাকে দেখে আসি,' বলে চলে গেল দোতলায়।

দোতলায় থাকেন বাড়ীওয়ালা অবিনাশবাবু, অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক। উজ্জ্বল তার ছোট ছেলে, বয়স পনেরো বছর। স্কুলের স্পোর্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অন্যান্য বছরের মত এবারও, কিন্তু এবারের বিশেষত্ব হচ্ছে সে সর্বশেষে লম্বা বাঁশে ভর দিয়ে অনেক উঁচু লাফ দিয়ে হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে পা জখম করে এসে ব্যাণ্ডেজ-করা পা নিয়ে ডাক্তারের নির্দেশে বিছানায় বিশ্রাম করছে। ডাক্তারবাবু অবিনাশবাবুকে বলেছেন পা-টাকে একেবারে বিশ্রামে রাখা দরকার অন্তত হপ্তা-দেড়েকের জন্য, সুতরাং উজ্জ্বলের মত চঞ্চল ছেলেকে যেন বিছানা ছেড়ে উঠে মাটিতে পা লাগাতে দেওয়া না হয়।

দোতলায় উঠে গিয়ে উজ্জ্বলের পাশে বসে পড়ে রীতা বলল, 'এখন কেমন আছ উজ্জ্বলদা?'

উজ্জ্বল খুশি আর বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছাই আছি! এরকম শুয়ে শুয়ে কেউ কখনো ভাল থাকতে পারে? ঐ ডাক্তারের কথায় বাবার যত কড়াকড়ি, বিছানা ছেড়ে আমি নড়তে পারব না। সেরে উঠে আমি ডাক্তারকে মজা দেখিয়ে দেবো, দেখিস তুই।'

রীতা বলল, 'ছিঃ, ডাক্তারদের মজা দেখাতে নেই, উজ্জ্বলদা। ওঁরা না থাকলে কী মুশকিল হত বলো তো?'

'ছাই হত!' বলল উজ্জ্বল। 'কিন্তু তুই যখন বলছিস, তখন ডাক্তারকে কিছু বলব না। ভয় নেই।'

ডাক্তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল রীতা, উজ্জ্বলদা কিছু বলবে না তাঁকে। রীতার এককথায় ডাক্তারের অপবাধ মার্জনা করে দিল উজ্জ্বল। এইজন্যেই উজ্জ্বলদাকে এত ভালো লাগে রীতার।

উজ্জ্বলের মা এসে রীতাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'আজ ইস্কুলে গেলে না, রীতা?'

রীতা বলল, 'বাবা মানা করলেন, মাসিমা। বাবার কলেজ নেই কিনা, তাই।' তারপর একটু ভেবে বলল, 'পৃথিবী শীগ্‌গিরই ধ্বংস হবে, জানেন মাসিমা?'

উজ্জ্বলের মা কৌতুক বোধ করে শুধালেন, 'তাই নাকি, রীতা? কে বললে তোমাকে?'

রীতা বলল, 'বাবা। বেশ মজা হবে। আমি পৃথিবী ধ্বংস হতে কখনো দেখি নি।'

'তাহলে তো এবারকার সুযোগটা কিছুতেই হারান চলবে না বাছা,' বললেন উজ্জ্বলের মা। কাচের জাগে আপেলের রস নিয়ে এসেছিলেন তিনি, দুটি কাচের গ্লাসে ঢেলে দিলেন ওদের দু জনের হাতে। উজ্জ্বলকে কিছু বলবার দরকার ছিল না, রীতাকে বললেন, 'আপেলের রস। খেয়ে গায়ে জোর করে নাও। পৃথিবী-ধ্বংস দেখতে হবে যে।'

আপত্তি জানাল রীতা। ওর ইচ্ছা, উজ্জ্বল সবটা খাক, কারণ উজ্জ্বলেরই প্রয়োজন বেশি। গম্ভীরকণ্ঠে ধমক দিয়ে উজ্জ্বল বলল, 'মেয়েলী ন্যাকামি আমি পছন্দ করি নে, রীতা। তিন চুমুকে গেলাস খালি না করিস তো গাঁট্টা মেরে মাথা ফুলিয়ে দেব।'

তার প্রয়োজন হল না, উজ্জ্বলের সঙ্গে সঙ্গে রীতাও চুমুক দিয়ে তার নিজের গ্লাস খালি করে ফেলল।

চলে গেলেন উজ্জ্বলের মা। আপেলের রস খাওয়ান হল। এবার গল্প করুক ওরা দুটিতে।

পৃথিবীকে আসন্ন ধ্বংসের মুখে ফেলবার জন্যে অনেকগুলি গ্রহ যে ষড়যন্ত্র করে রেখেছে, সে খবর খবরের কাগজ এবং মুখে মুখে ছড়ান গুজবের কৃপায় অজানা ছিল না তাঁর এবং অবিনাশবাবুর। তাতে তাঁদের নিদ্রার বা স্বস্তির কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটে নি।

উজ্জ্বলকে দেখতে রীতা দোতলায় উঠে গেলে অনিমেষ রায়

ভাবতে লাগলেন রীতা আর উজ্জ্বলের কথা, ওদের বর্তমান সম্পর্কটা এভাবেই ক্রমপরিণতির পথে এগিয়ে চলতে থাকলে, ভবিষ্যতে কিরকম দাঁড়াবার সম্ভাবনা, সেই কথা। বাসন্তী মিত্র আর অশোক কাঞ্জিলালের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল সেই সঙ্গে। কিন্তু না, রীতা-উজ্জ্বল সম্পর্কটা বাসন্তী-অশোক সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অশোকের মত বড়লোকের অপদার্থ খামখেয়ালী উড়নচণ্ডী আধা-ভ্যাগাবণ্ড ছেলে নয় উজ্জ্বল। রীতাকে সে সাগ্রহ প্রীতির চোখে ছাখে, আর রীতাও উজ্জ্বলদার পরম ভক্ত। উজ্জ্বল ছেলেটা দেখতে-শুনতে-স্বভাবে-বুদ্ধিতে-লেখাপড়ায়-খেলাধুলোয় সব দিক দিয়েই ভাল; ছেলেটার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রীতা যদি তার অবচেতন মনে উজ্জ্বলদার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলে, আর উজ্জ্বলের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতে যদি তার পাশে দাঁড়াবার স্থান না হয় রীতার? তাহলে? ভবিষ্যতের সেই নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কথা ভেবে শিউরে উঠল অনিমেষ রায়ের স্নেহব্যাকুল পিতৃহৃদয়। এ কথাটা—কে জানে কেন?—আজই প্রথম আঘাত করল তাঁর সচেতন মনের বুকে। উজ্জ্বলের বাবা অবিনাশবাবু পঞ্চাশ শুরু হবার আগে থেকেই বানপ্রস্থ নিয়েছেন বলা যেতে পারে, যদিও বনে যান নি। অর্থাৎ তাঁকে খেটে খেতে হয় না, অনর্জিত আয়ে বেশ ভালভাবেই তাঁর চলে যায়। পৈতৃক ছুখানা বাড়ি আছে তাঁর—একখানা শহরের মাঝামাঝি, সেটা পুরো ভাড়া দিয়েছেন চারটি ফ্ল্যাটে ভাগ করে; আরেকটি শহরের উপকণ্ঠে, তার দোতলায় তিনি থাকেন আর একতলার ভাড়াটে অধ্যাপক অনিমেষ রায়। নিজে বি এ., বি.এল। বইটই পড়বার নেশা আছে, লেখাপড়ার কদর বোঝেন, অনিমেষ রায়ের ওপর শ্রদ্ধা আর প্রীতি মিশ্রিত একটা ভাবও তাঁর আছে, কিন্তু তবু তো তাঁদের ছু জনের মাঝখানে রয়ে গেছে একটা

অনুচ্চারিত দূরত্ববোধ। উজ্জ্বলের সেই নিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কলকাতার দুখানা বাড়ির মালিক কি রাজি হবেন একজন বাড়িহীন দর্শনের অধ্যাপকের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে? অসম্ভব। কৃতী ছেলের বাড়িওয়ালা বাবা তিনি নিশ্চয় চাইবেন ছেলের কৃতিত্বের টোপ ফেলে দাঁও মারতে, সেক্ষেত্রে এখনকার শ্রদ্ধা বা প্রীতি কোনো কাজ করবে না।

'তবে কি উজ্জ্বলের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করে মেয়েটা নিজের ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ বপন করছে?' ভাবলেন অনিমেষ রায়। 'তবে কি উজ্জ্বলের সঙ্গে রীতার মেলামেশাটা কায়দা করে কমিয়ে আনতে হবে, যাতে রীতার মনটা উজ্জ্বলময় হয়ে উঠবার সুযোগ না পায়?'

উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের মুখে। কিন্তু ওরা দু জনে দু জনের এত প্রিয় এত আপন হয়ে উঠেছে, এখন বিচ্ছিন্ন করতে গেলে দু জনেরি যে ব্যথা লাগবে নিদারুণ, বিশেষ করে রীতার। ভবিষ্যৎ দুঃখের সম্ভাবনা এড়াবার জন্যে কি মেয়েটাকে বর্তমানে দুঃখ দিতে হবে? না না, তাও তো অসম্ভব'।

'অসম্ভব,' নিজের মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলেন অনিমেষ রায়।

প্রশ্ন করবেন কি করবেন না তাই কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন হিমানী রায়। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'কী ভাবছ?'

অনিমেষ রায় বললেন, 'ভাবছিলাম রীতার ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই।'

সত্যিই নেই, ভাবলেন মনে মনে। হপ্তাখানেকের ভেতর গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎই তো খতম হয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, ভবিষ্যতের চাইতে বরং ওর বর্তমানটাই ভাবা দরকার,' বললেন হিমানী রায়। 'ভবিষ্যতের খাতিরে বর্তমানকে ভুলে থাকলে ভবিষ্যৎও সে ভুল ক্ষমা করে না।'

কথাটা সহজস্বরে বলা হলেও খুব সহজভাবে বলা হয় নি বলে সন্দেহ হল অনিমেষ রায়ের। তাঁর নিঃসন্দেহে মনে হল এই কথাটির পিছনে রয়েছে হিমানীর অনেক দিনের জমান নালিশ, যা বছরের পর বছর অনুচ্চারিত থেকে আজই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হল। ভবিষ্যতের বেদীতলে তিনি অন্ধের মত বরাবর বর্তমানকে বলি দিয়ে আসছেন, এই কথাটাই তাঁকে আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছেন হিমানী রায়। আশাভঙ্গের বেদনাবোধ আর অভিমানও যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে হিমানীর কথার সুরে।

কয়েক মুহূর্তের ভেতর হিমানীর সঙ্গে তাঁর এত দিনের যুগ্মজীবন পর্যালোচনা করে গেলেন মনে মনে অনিমেষ রায়। কী আশা করে অনিমেষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে অনিমেষের কাছ থেকে কী পেয়েছেন হিমানী? অর্থবান পিতার আদরে-লালিতা হিমানীকে তিনি আর্থিক সচ্ছলতায় রাখতে পারেন নি; আর্থিক সচ্ছলতার জন্য তিনি চেষ্টাও করেন নি, বরং তার নানা সুযোগকে দার্শনিক-সুলভ অবহেলার সঙ্গে প্রত্যাখানই করেছেন। অথচ হিমানীকেও অর্থোপার্জনের পথে পা বাড়াতে দেন নি; রুচিতে, ঔচিত্যবোধে এবং আত্মমর্যাদায় বেধেছে। তারপর তাঁদের দু জনের সংসারে এল নতুন অতিথি—রীতা, দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে লাগল, হিমানীরই ছোট্ট সংস্করণ যেন। কিন্তু--আজ অনিমেষ রায়ের মনে সন্দেহ হতে লাগল—দর্শনচর্চায় মশগুল থেকে হিমানী আর রীতার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ তিনি দেবার অবসর পান নি, সেই অবহেলা নীরব অভিমানে সয়ে এসেছেন হিমানী রায়।

অনিমেষ দর্শনের ক্লাস নিয়েছেন কলেজের রুটিন-মাফিক, আর ছক-বাঁধা কলেজী কাজের বাইরে ভবিষ্যতের জন্য দর্শনের দেশী বিদেশী নানা গ্রন্থ মন দিয়ে পড়েছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন এবং দার্শনিকদের জীবন- ও দর্শন-সম্পর্কে বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা

করে গেছেন দিনের পর দিন, অক্লান্ত পরিশ্রমে। এমন ভাবে আর এমন ভঙ্গিতে লিখেছেন, যেন সেই গ্রন্থ দর্শনের পণ্ডিত এবং ছাত্র ছাড়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষেও সহজপাঠ্য হতে পারে। দর্শন-ভীত সাধারণকে দর্শন-রসে রসিক করে তোলাই অনিমেষ রায়ের উদ্দেশ্য, এই তাঁর জীবনের ব্রত যেন। কিন্তু এই ব্রতের নেশায় জীবনের অন্য দিকগুলো তিনি অবহেলা করেছেন, জীবন-সঙ্গিনীকে এবং আত্মজাকে তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রেখেছেন, অনিমেষেব মনে হল হিমানীর কথার সুরে যেন ইঙ্গিতটা এইরকম। ভবিষ্যতের উপাসনা করে তিনি বরাবর বর্তমানকে উপেক্ষা করেছেন।

কিন্তু নিজের জন্যে চেতন বা অবচেতন মনে যতই নালিশ থাক হিমানী রায়ের, নিজের কথা কিছুই বললেন না তিনি। বললেন, 'মেয়েটা তোমার সঙ্গ একেবারে পায় না, অথচ মনে মনে তোমার সঙ্গের কাঙাল। যতক্ষণ তুমি জেগে থাকো, ততক্ষণ বোধকরি দর্শন তোমার মন জুড়ে থাকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়তো দর্শনের স্বপ্ন দেখ তুমি। মেয়েটার দিকে তাকাবার পর্যন্ত তোমার সময় নেই।'

কথাগুলো বাইরের বিচারে সত্যি, ভেবে দেখলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। হিমানী, রীতা আর তিনি যেন তিনে মিলে এক আত্মা, এমনি একাত্মতা বোধ করে এসেছেন তিনি। কিন্তু সে তো ভেতরের কথা; এই একাত্মবোধের বহিঃপ্রকাশও যে দরকার, এইটে তিনি খেয়াল করেন নি। আর সেই জন্যেই তিনি উদাসীন, এমনকি মমতাহীন বলে প্রতিভাত হয়েছেন হিমানী আর রীতার কাছে। এইজন্যেই কি তাঁর সঙ্গ ছেড়ে উজ্জ্বলদাকে দেখবার অজুহাতে ওপরে চলে গেল রীতা? হয়তো তাই। অতিরিক্ত দর্শনচর্চা করে তিনি অনেক বিষয়ে একেবারে অন্ধ হয়ে ছিলেন, মনে হল তাঁর।

আজ রীতাকে স্কুলে যেতে দেন নি অনিমেষ রায়, এটা একটা আশাতীত শুভ লক্ষণ বলে মনে হয়েছিল হিমানী রায়ের। কারণটা

যাই হোক, তবু মেয়েটাকে কিছুক্ষণ কাছে রাখবার ইচ্ছা জেগেছে এমন দর্শন-মত্ত উদাসীন বাপের মনে, একি কম কথা ?

'আজ তোমার কলেজ ছুটি, মেয়েকেও স্কুলে যেতে দিলে না, ভালই করেছ,' বললেন হিমানী রায়। 'আজ মেয়েটাকে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াও, যা তুমি কখনো করো নি। জীবনে অন্তত একটা দিন মেয়েটা বাপের সঙ্গে একটু মনের আনন্দে বেড়াক।'

'খুব ভাল,' সহজ হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললেন অনিমেষ রায়। 'চলো আজ তিন জনে মিলে অনেক বেড়ান যাক। একটা ট্যাক্সি নিয়ে।'

ভাবলেন, ট্যাক্সি-ভাড়া অনেক লাগবে। তা লাগুক। কয়েক দিনের ভেতর পৃথিবীই শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখন আব টাকার মায়া করে লাভ কি ? শেষ কটা দিনেই তো টাকা খবচ করবার শেষ সুযোগ। তারপর তো অনন্ত শূন্য।

'আমি আজ বড় শ্রান্ত। বিশ্রাম চাই একটু,' বললেন হিমানী রায়। 'তাছাড়া মাকে তো অনেক পেয়েছে রীতা, পায় নি তোমাকে। আজ একটু পাক শুধু তোমার সঙ্গ।'

সত্যিই শ্রান্ত হিমানী রায়, তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন অধ্যাপক অনিমেষ। তাঁর মনে হল এমন ঐকান্তিক অনুরোধ আর কখনো করেন নি হিমানী ; এ অনুরোধ রাখতেই হবে।

'কিন্তু তুমি অসুস্থ, তোমাকে একা ফেলে—' বললেন অনিমেষ রায়।

'শ্রান্ত বলেছি, অসুস্থ তো বলি নি,' বললেন হিমানী রায়। 'তাছাড়া একা কোথায় ? বাসুর মা থাকবে।'

ধাঁধায় পড়ে গেলেন অনিমেষ রায়। মেয়েকে নিয়ে বেড়ান নি তিনি কখনো। বললেন, 'রীতাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবো বলো তো ? মিউজিয়াম ? চিড়িয়াখানা ? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ?'

হিমানী রায় বললেন, 'যেখানে তোমার খুশি, যেখানে যেতে চায় রীতা। আজ একটা দিন অন্তত মেয়েটা যা আবদার করে তা মেনে নেবার চেষ্টা কোরো।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বললেন অনিমেষ রায়।

সে দিন মেঘে-ঢাকা সূর্য মেঘ ভেদ করে আলো ছড়াচ্ছিল, কিন্তু গরম রোদ ছড়াতে পারছিল না, এবং মেঘের চেহারা দেখে প্রায় গ্যারান্টি দেওয়া চলত যে বৃষ্টি নামবে না, অথবা যদিও নামে তো মৃদু-মৃদু ঝিরি-ঝিরি।

ইলিশমাছ খেতে খেতে রীতার মনে পড়ে গেল প্রলয়-পয়োধিজলে যিনি বেদ ধারণ করেছিলেন, মাছের রূপধারী সেই কেশবের কথা :

'কেশব-ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।'

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংসের কথা।

'পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে, জানো রাসুর মা?' বলল রীতা। 'ধ্বংস জানো না? একেবারে চুরমার।'

রাসুর মা জানে না কি? সব জানে। রাসুর মা অনেক খবর রাখে। সে পরম নিশ্চিন্তকণ্ঠে বলল, 'একগাদা গ্রহ জোট বেঁধে পিরথিবিটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার মতলব এঁটেছিল বটে, কিন্তু সব ভেস্তে গেছে।' অর্থাৎ গ্রহেরা জব্দ হয়ে গেল, পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হবে না, সুতরাং এবিষয়ে রাসুর মার অন্তত আর-কোনো ভাবনা নেই।

এতে রীতার যেন একটু আশাভঙ্গ হল, যেন একটা মস্ত তামাশা দেখবার সম্ভাবনা থেকে তার বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সে বলল, 'কী করে ভেস্তে গেছে, রাসুর মা?'

রাসুর মা বলল, 'যাবে না? সারাটা দেশ জুড়ে যে গ্রহশান্তি যজ্ঞি চলছে গো দিদিঠাকরুন? কত লোক সব অষ্টধাতুর গ্রহশান্তি

মাদুলি ধারণ করছেন ; আমিও একটা মাদুলি নিয়ে হাতে বেঁধেছি, এই দেখুন না। আপনাদের বলি নি, আপনারা নেকাপড়া বিদ্যে শিখেছেন, আপনারা তো আর বিশ্বেস করবেন না। আর বিশ্বেস না করলে এসবে ফলও হয় না।'

কৌতূহল বোধ করলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। বললেন, "কার মাদুলি তুমি ধারণ করেছ, রাসুর মা ?' এতগুলো গ্রহ জোট বেঁধে পৃথিবীকে ধ্বংস করবে বলে কোমর বেঁধেছে, দুনিয়া-সুদ্ধ কাগজে কাগজে আর মুখে মুখে তাই নিয়ে কত মাথা ঘামান, কত উত্তেজনা, কত শিহরন, আর রাসুর মা একটি মাদুলি ধারণ করে নিশ্চিন্ত আছে মহাপ্রলয় তার নাগাল পাবে না!

রাসুর মা'র সঙ্গে অনিমেষ রায় এই সর্বপ্রথম কথা কইলেন। ধন্য হয়ে গেল রাসুর মা। বলল, 'মাদুলি দিচ্ছেন জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবা।'

'অগ্নিবাবা ? জগদ্‌গুরু ?' বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অনিমেষ রায়।

রাসুর মা বলল, 'আপনি জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবার নাম শোনেন নি কর্তাবাবু ? উনি যে কলিযুগের মস্ত মহাপুরুষ। অনেকে সন্দ করেন উনিই কল্‌কি অবতার। কত যে ভক্ত ওঁর ! লোকের ভিড় তো লেগেই আছে।'

'কোথায়, রাসুর মা ?'

'নন্দন-ময়দানে, যেখানে গ্রহশান্তি মহাযজ্ঞি হচ্ছে। দিনরাত হোমের আগুনে ঘি পুড়ছে। হাজার হাজার মণ ঘি পুড়বে। যজ্ঞির মহাপুরুত জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবা, জগৎ রক্ষে করবার ভার নিয়েছেন যিনি। মস্তবড়ো মহাপুরুষ। চোখের পানে তাকানো যায় না, এমনি ব্রহ্মতেজ। দেখতে পঞ্চাশ-ষাট, কিন্তু বয়স পাঁচশো বছরের বেশি। তপস্যা করেন হিমালয়ের গুহায়। সেইখান থেকে ভক্তেরা অনেক সাধ্যি-সাধনা করে ওঁকে নামিয়ে এনেছেন। মহাযজ্ঞি করে

আমাদের সর্বনেশে ফাঁড়ার মেয়াদ কাটিয়ে দিয়েই আবার উনি গুহায় ফিরে যাবেন।'

নন্দন-ময়দানে, অর্থাৎ ধনকুবের বনোয়ারীলাল নন্দনের মস্ত মাঠ জুড়ে অগ্নিবাবার প্রধান পৌরোহিত্যে একটা হৈ-হৈ হুজুগের ব্যাপার চলছে, এ খবর অনিমেষ রায় শুনেছিলেন বটে, কিন্তু ও বিষয়ে মাথা ঘামান দরকার মনে করেন নি।

'মহাপুরুষের নাম অগ্নিবাবা কেন?' শুধালেন তিনি।

রাস্থর মা বলল, 'দেশালাই জ্বালতে হয় না, মন্ত্র পড়েই উনি আগুন জ্বালতে পারেন। যজ্ঞির হোমকুণ্ডে ওঁকে মন্ত্র পড়েই তো প্রথম আগুন জ্বালতে দেখলাম। কুণ্ডে ছিল শুধু শুকনো কাঠের টুকরো কতকগুলো, আর কিচ্ছু নয়। তার ওপর সংস্কৃতো অগ্নিমন্ত্র পড়ে তিন বার ওম্ ওম্ ওম্ বলে ফুঁ দিলেন, আর অমনি কাঠের ওপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।'

রীতা বায়না ধরে বসল, 'আমি অগ্নিবাবার ফুঁ দিয়ে আগুন ধরান দেখবো, বাবা।'

'কিন্তু হোমাগ্নি তো ধরান হয়েই গেছে, রীতা,' বললেন অনিমেষ রায়। 'অগ্নিবাবা তো আর রোজ মন্ত্র পড়ে আগুন জ্বালান না।'

'রোজ জ্বালান,' জানাল রাস্থর মা। হোমকুণ্ডে নয়, ধুনুচিতে। নন্দন-ময়দানের মহাযজ্ঞ-মণ্ডপে রোজ বিকেল তিনটেতে এসে বেদীতে বসেন অগ্নিবাবা, তাঁর আসনের সামনে থাকে মস্ত এক ধুনুচি। ধুনুচির ওপর সাজিয়ে দেওয়া হয় কুঁচিয়ে কাটা নারকেলের ছোবড়া, আর তার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় ধূপের গুঁড়ো। অগ্নিবাবা মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতেই দপ্ করে আগুন ধরে যায় ছোবড়ায়, উঠতে থাকে ধূপের ধোঁয়া। তারপর অগ্নিবাবা স্তোত্র পাঠ করেন আর বাণী দেন। তারপর মাদুলী-প্রার্থীদের মাদুলি বিতরণ শুরু হয়, যে

মাদুলি ধারণ করলে আসন্ন প্রলয় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মাদুলির কোনো দাম নেই, শুধু প্রণামী বাবদ সওয়া পাঁচ আনা।

শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল রীতা। মাদুলির জন্য নয়, মন্ত্রবলে ধুনুচিতে অগ্নিবাবার আগুন-ধরান দেখবার জন্য। রীতা তখনই 'নন্দন-ময়দান' অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে চায়।

'কিন্তু তিনটে বাজতে যে এখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি, রীতা,' বললেন অনিমেষ রায়। 'এত আগে নন্দন-ময়দানে গিয়ে করবে কী?'

'অনেক কিছু দেখবার আছে, কর্তাবাবু,' বলল রাম্বুর মা। 'অনেক লোক যাচ্ছে যে। গিয়ে দেখবেন এখন।'

মনিব্যাগটা সাবধানে জামার ভেতরের বুক-পকেটে ভরে নিলেন, তারপর রীতাকে নিয়ে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন অনিমেষ রায়। উঠে বসলেন কন্যাসহ; বললেন 'নন্দন-ময়দান'। ট্যাক্সি ছুট্‌ল হুহু করে। এসে পৌঁছল নন্দন-ময়দানে। নামলেন অনিমেষ রায় মেয়েকে নিয়ে। ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিলেন ট্যাক্সি।

'নন্দন-ময়দান' মানে অনেকখানি লম্বা চওড়া জমি। তারি ওপর যেন এক বিরাট মেলা বসেছে। একটা বিরাট মণ্ডপ তৈরি হয়েছে, সার্কাসের তাঁবু যেন। তাঁবুর ভেতর থেকে ভেসে আসছে সমবেতকণ্ঠে করতালাদি সহযোগে রামধুন:

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিতপাবন সীতারাম।'

মণ্ডপের প্রধান প্রবেশপথে একটা বিরাট তোরণ, তার ওপর মণ্ডপের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাল কাপড়ের বুকে সাদা তুলোর অক্ষরে দেবনাগরী আর বাংলা হরফে বেশ বড় করে লেখা:

গ্রহশান্তি মহাযজ্ঞ সম্মেলন
নন্দন-ময়দান

অনেক দূর থেকে দেখা যায়, চোখে পড়ে, আর সহজেই পড়া যায়। এবং যাঁরাই পড়েন তাঁদের মনে গেঁথে যায় ব্র্যাকেটোক্ত নামটি, অর্থাৎ 'নন্দন-ময়দান'। ময়দানের পূবদিকে রেল-লাইন। এ লাইনে যত ট্রেন চলাচল করে, তাদের যাত্রীদের একটা বড় অংশ জেনে যান, ধ্বংস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্যে বুক পেতে দিয়েছে নন্দন-ময়দান। বড়লোক বনোয়ারীলাল নন্দনের এই মেঠো সম্পত্তিটি—যাকে তিনি দামী সম্পদে পরিণত করে তুলতে চান—বিখ্যাত হয়ে উঠছে এই গ্রহশান্তি-মহাযজ্ঞ-সম্মেলনেব কল্যাণে। মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের কার্যকবী সমিতির একজন বড় পাণ্ডা বনোয়ারীলাল নন্দন, এবং এই মহাযজ্ঞের মওকায় তাঁর এই জমিটির নামকরণ করে নামটি চালু করেছেন তাঁর ম্যানেজার এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি জয়গোপাল বর্মন। বনোয়ারী নন্দনের ডানহাত জয়গোপালবাবু।

'কলেজ যান নি স্যার?' বলে একটি যুবক এসে প্রণাম করল অধ্যাপক অনিমেষ রায়কে। প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই অনিমেষ তার মুখের দিকে তাকালেন।

যুবক বিনয়ের হাসি হেসে বলল, 'আমি আপনার স্টুডেন্ট, স্যার মানে ছাত্র।'

'খুব খুশি হলাম,' বললেন অনিমেষ রায়। 'কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না।'

যুবক বলল, 'আমি আপনার ক্লাসে পড়ি নি, আমার ফিলজফি ছিল না। কয়েক বছর হল বি.এ. ফেল করে বেরিয়েছি। সম্প্রতি

'সংবাদ-হরকরা' সাপ্তাহিকের আমি চীফ রিপোর্টার হয়েছি, অর্থাৎ প্রধান সাংবাদিক। এই আমার কার্ড।

ছাপা কার্ডখানা হাতে নিয়ে অনিমেষ রায় পড়লেন ঃ

তপোবন পাকড়াশী,

প্রধান-সাংবাদিক,

'সংবাদ-হরকরা'

(বাংলার বিচিত্রতম সংবাদ সাপ্তাহিক)

'তপোবন নামটা,' বললেন অনিমেষ। 'বোধহয় তোমার ছাড়া দুনিয়ায় আর কারও নেই।'

'সংবাদ-হরকরা'র প্রধান সাংবাদিক বলল, 'আসলে এ নামটা আমারও নেই, স্যার। "তপোবন" ছাপার ভুল। কম্পোজিটরের ভুল প্রুফ-রীডারের নজর এড়িয়ে গিয়ে কার্ডে ছাপা হয়ে গেছে। আমার বাবার দেওয়া নাম তপোধন।' মালিক-সম্পাদক বললেন, 'দুশো আইভরি-ফিনিস কার্ড বাতিল করা চলে না, ছাপার ওপর কালি দিয়ে কাটাকুটিও ভাল নয়, তোমার সাংবাদিক নাম তপোবনই থাক।' আমি বললাম, 'বেশ।—এটি বুঝি আপনার মেয়ে, স্যার? কী নাম তোমার খুকু?'

অনিমেষ রায় বললেন, ' "খুকু" বোলো না তপোবন, খুকু বললে ও চটে যায়। এখনও ফ্রক পরলে কি হবে? ও এখন দস্তুরমত লেডি।'

রীতা বলল, 'আমার নাম রীতা। রীটা নয়, রীতা।'

'খুব ভাল নাম, স্যার। আপনিই রেখেছেন বোধ হয়?' বলল সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী।

'ওর মা,' বললেন অনিমেষ রায়।

তপোবন পাকড়াশী বলল, 'ওয়াণ্ডারফুল, মানে অতি আশ্চর্য।'

হিমানী তাঁর মেয়েব নাম বেখেছেন রীতা, এর ভেতর অতি আশ্চর্যের কিছু পেলেন না অনিমেষ রায়। তাঁর বরং আশ্চর্য লাগল এই ছেলেটিকে, আব তার এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবির্ভাবকে।

'আপনি এখানে আবো এসেছেন, স্যাব, নাকি আজকেই—' বলল সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী।

'আজকেই প্রথম,' বললেন অনিমেষ বায়।

তপোবন পাকড়াশী খুশি হয়ে বলল, 'ভাল দিনে এসেছেন, স্যার। আজ ভাল প্রোগ্রাম আছে।'

'অগ্নিবাবা শুধু ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবেন তো?' বললেন অনিমেষ রায়। 'রীতা তো তাই দেখবে বলে এসেছে।'

'ঐটে দেখতেই অনেকে আসে, স্যাব,' বলল সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী। 'কিন্তু আজ আছে স্পেশাল প্রোগ্রাম, অর্থাৎ কিনা বিশেষ অনুষ্ঠান। জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবাব সভাপতিত্বে সম্মেলনের বিশেষ বৈঠক বসবে সন্ধ্যেবেলায়। সেই বৈঠকটা "কভার" কবতে হবে আমাকে। আসন্ন মহাপ্রলয় এবং সর্বাত্মক ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবাব উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা আব আলোচনা কববেন অনেক পণ্ডিত, রিটায়ার্ড সেসন্‌স্ জজ, প্রিন্‌সিপাল, শিল্পপতি, কাউন্সিলর, লেখক—আরো অনেকে। কাগজেব সভাসমিতি স্তম্ভে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, দেখেন নি স্যার?'

মাথা নাড়লেন অনিমেষ রায়, অর্থাৎ দেখেন নি তিনি। দেখলেও এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। এরা কি সত্যিই ভাবছে বিধির বিধান ভাঙবে, এমনি শক্তিমান এরা? পৃথিবীর সারা বুক জুড়ে সঞ্চিত হয়েছে মানুষের বহু যুগের পাপের ভার, এ ভার আর সইতে

পারছে না পৃথিবী, তাই তারই প্রার্থনায় তার বিলুপ্তির ব্যবস্থা চূড়ান্ত পাকা করে ফেলেছেন বিধাতা, চরম ধ্বংস আসন্ন, আর কোনো আশা নেই। তবু এসব কী ছেলেখেলায় মেতেছে এরা? মাতুক, আর কটা দিন তো মোটে।

'বক্তৃতায় আমার রুচি নেই, তপোবন। রীতারও নয়,' বললেন অনিমেষ রায়। 'আমরা অগ্নিবাবার মন্ত্রবলে আগুন জ্বালান দেখতে এসেছি, দেখেই চলে যাবো।'

'তার তো কিছুটা দেরি আছে, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'তার আগে আসুন একটু ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।'

বৃষ্টির আশঙ্কাহীন হাল্‌কা মেঘের মধ্য দিয়ে নেমে আসছে সূর্যের দাহহীন আলো। তার ওপর বসন্তের মৃদু বাতাসও বইছে নন্দন-ময়দানের বুকের ওপর দিয়ে। এমনি আবহাওয়ায় নন্দন-ময়দানের বুকের ওপর মৃদু পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সকন্যা অনিমেষ রায়, সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশীর পরিচালনায়।

রামধুন গাইছেন দর্জিহাটার বিখ্যাত 'রামধুন'-সম্প্রদায়, সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশীর মুখে শুনলেন অধ্যাপক অনিমেষ। ধ্বংস-প্রলয়-সম্ভাবনার পুরো সপ্তাহ জুড়ে অবিরাম রামধুন সরবরাহ করবার কনট্রাক্ট নিয়েছেন এঁরা। প্রলয়-সপ্তাহ শেষ হয়ে পৃথিবীর ধ্বংস-ফাঁড়া কেটে না-যাওয়া পর্যন্ত এঁরা বিনা বিরতিতে রামধুন চালিয়ে যাবেন, সেই রামধুন তরঙ্গ গিয়ে প্রতিমুহূর্তে ধাক্কা মারবে ঐ সম্মিলিত গ্রহগুলির গায়ে। এঁরা চব্বিশ জন করে চারটি দলে বিভক্ত, প্রত্যেক দলের দৈনিক ছয় ঘণ্টা করে ডিউটি, প্রত্যেক গায়কের দৈনিক দক্ষিণা দেড়টাকা।

ধ্বংস-নিরোধক এই মহাযজ্ঞ-সম্মেলনের উদ্যোক্তা সেরা সেরা শিল্পপতি এবং ব্যবসাদারবৃন্দ, বলল বহুজান্তা বিচিত্র-সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী। প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তাঁদের

কলকারখানা, ব্যবসা সব মাটি হয়ে যাবে, সুতরাং সভায় প্রস্তাব পাস হল যেমন করে হক পৃথিবীটাকে রক্ষা করতেই হবে। দ্রুতবেগে চাঁদা উঠল, গঠিত হল 'পৃথিবী রক্ষা সমিতি'। এই সমিতির পরিকল্পনা এবং পরিচালনাতেই নন্দন-ময়দানে এই মহাযজ্ঞ-সম্মেলন। পৃথিবী রক্ষা করবার জন্যে জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবাকে আবিষ্কার করে তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে প্রকাশ্যে এনেছে এই সমিতি।

বিরাট মণ্ডপের এক অংশে বিশেষ প্রদর্শনী। সেখানে মাটির তৈরি পুতুলে আর মডেলে দেখান হয়েছে দশাবতার। তাতে প্রলয়পয়োধিজলে মীনরূপী কেশবের পিঠে বেদ ধরা দেখে খুশি হয়ে উঠল রীতা। উঠল হাততালি দিয়ে।

'এ তো হল আমাদের দিশি প্রলয়, মানে সংস্কৃত শাস্তোরের প্রলয়,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'বিদেশী প্রলয়ও আছে, মানে বাইবেলী প্রলয়। আসুন এই দিকে।'

এবারকার মডেলে দেখান আছে বন্যায় ডুবে গেছে পৃথিবী, ডোবে নি শুধু ভগবানের প্রিয়ভক্ত নোয়া-র বিরাট নৌকো। নৌকোর ভেতর রয়েছে সস্ত্রীক নোয়া, তার তিন পুত্র এবং তিন পুত্রবধূ, এবং মানবেতর প্রত্যেক রকম জীবের একজোড়া, অর্থাৎ দম্পতি। নৌকোটির আশ্রয় একটি পাহাড়ের চূড়া। মডেলের পিছনের বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা আছে বাইবেলোক্ত প্রলয়বন্যার কাহিনী। পাপে মলিন পৃথিবীকে নির্মল করবার জন্যে ঈশ্বরপ্রেরিত এই প্রলয়বন্যা, যাতে পৃথিবীর বাকি সব মানুষ মরে গেল, বেঁচে রইল শুধু নোয়ার পরিবার।

মডেল দেখতে ব্যস্ত রীতা। অনিমেষ রায় বললেন, 'এবার কেউ বাঁচবে না, তপোবন।'

'কেউ বাঁচবে না স্যার?' বলল বিস্মিত তপোবন পাকড়াশী।

'না। পৃথিবীও নয়,' বললেন অনিমেষ রায়। 'বহু যুগের বহু

পাপের বোঝা বয়ে বয়ে অতিষ্ঠ পৃথিবীও নিজের ধ্বংস কামনা করছে। তাই এই অভূতপূর্ব গ্রহ-সমাবেশ। না তপোবন, পৃথিবীর ধ্বংস এবার কেউ রুখতে পারবে না।'

'কিন্তু স্যার, রুখবার জন্যেই হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন অগ্নিবাবা। পৃথিবীর ফাঁড়াটা কাটিয়ে দিয়ে আবার হিমালয়েই ফিরে যাবেন।'

'ফিরে যাবার হিমালয় আর থাকবে না, তপোবন। বাকি পৃথিবীর মতই অণুতে অণুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে অনন্ত শূন্যে। এই বসন্তই পৃথিবীর শেষ বসন্ত, তপোবন।'

শুনে তপোবন বলল, 'ভারি আশ্চর্য, স্যার। অশোকের মতও যে প্রায় আপনারই মত।'

'অশোক?' চমকে উঠে বললেন অনিমেষ বায়। 'কোন্ অশোকের কথা তুমি বলছ, তপোবন?'

'অশোক কাঞ্জিলাল। আপনার ক্লাসের ছাত্র। তাকে আপনি নিশ্চয় চেনেন, স্যার।'

'চিনি। সেও কি বলে, এবাবের বসন্তই পৃথিবীর শেষ বসন্ত?'

'হলে তার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, এই কথা বলে সে,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'অশোকের কথায় আর মনে একফোঁটা ভেজাল নেই। আশ্চর্য মানুষটা! "সংবাদ-হরকরা" সাপ্তাহিক আজ এত জমজমাট, এর মূলে অশোক। মানে ওর টাকা, যাকে বলে ক্যাপিটাল, অর্থাৎ কিনা ফিনানশিয়াল ব্যাকিং। আর আমি আজ যা হয়েছি, তার মূলেও স্যার, ঐ অশোক কাঞ্জিলাল।'

তপোবনের কথার সুর শুনে মনে হল সে অশোক কাঞ্জিলালের মহাকৃতজ্ঞ ভক্ত। এতে তিনি খুব খুশি হতে পারলেন না। বললেন, 'অশোক শনিবারে শনিবারে ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ো খেলে, জান বোধ হয়?'

'জানি, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'ও হল অশোকের সিনেমা দেখার পরিবর্ত। বন্ধ ঘরের গুমোটে দমবন্ধ করে পর্দার বুকে মরা ছবি না দেখে, সে মুক্ত আকাশের তলায় ভাখে জ্যান্ত ঘোড়ার দৌড়। ও হল তার উইক-এণ্ড হেল্‌দি রিক্রিয়েশান, অর্থাৎ কিনা সাপ্তাহান্তিক স্বাস্থ্যকর নির্দোষ চিত্তবিনোদন।'

'নির্দোষ? রেস-খেলাকে তুমি নির্দোষ আমোদ বলছ, তপোবন?' ব্যথিত বিস্মিতকণ্ঠে শুধালেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'ঘোড়দৌড়ী জুয়োর অতল গহ্বরে কত ঐশ্বর্য তলিয়ে যায়, তা কি সাংবাদিক হয়েও তুমি জানো না? ধ্বংস হবার সোজা রাস্তা এই জুয়ো—দ্য রয়েল রোড টু রুইন।'

ধ্বংস! পৃথিবীই তো ধ্বংস হতে চলেছে। সেও কি মারাত্মক জুয়ো-খেলারই অনিবার্য ফল নয়? না, পৃথিবী জুয়ো খেলে নি, জুয়ো খেলেছে পৃথিবীর মানুষজাতি। জুয়ো খেলেছে নিজের আত্মাকে নিয়ে, সঁপে দিয়েছে শয়তানের হাতে। মানুষের পাপের ফলেই নোয়ার আমলের বন্যায় একবার পৃথিবী সাফ হয়েছিল, তারপর শুরু হয়েছিল মানুষজাতের নতুন পর্যায়। কিন্তু তারপর আবার যে-কে-সেই। আবার পৃথিবী সাফ করলে আবার নতুন মানুষ নতুন করে পৃথিবী নোংরা করবে, নতুন করে আবর্তিত হবে পুরোন ইতিহাস। এবারের প্রলয় তাই একেবারে চরম রূপ নেবে পৃথিবী বিলোপের, যেন পুরোন ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হবার জায়গা না পায়।

'কিন্তু ঘোড়দৌড়ী গহ্বরের সাধ্য নেই তলিয়ে নেয় অশোক কাঞ্জিলালকে,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'অশোককে যিনি রেস-টিপ যোগান, তিনি ঘোড়দৌড়-জগতের একজন পুরোন সেরা ওস্তাদ, অর্থাৎ কিনা অভিজ্ঞ এক্সপার্ট। রেস-টিপের জন্যে তিনি একটা বাঁধা মাসোহারা পান অশোকের কাছ থেকে।'

'তার দেওয়া টিপে ঘোড়া ব্যাক করে কয়বার বাজী জিতেছে অশোক ?' শুধালেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

মাথা নাড়ল সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী হাসিমুখে। বলল, 'একটি বারও জেতে নি আজ পর্যন্ত। যে দিন জিতবে সে দিন ঐ রেস-টিপ-দেনেওয়ালার অশোকী চাকরিটি যাবে, অর্থাৎ মাসোহারাটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ওঁর সঙ্গে অশোকের চুক্তি হচ্ছে, উনি অশোককে এমন ঘোড়ার টিপ দেবেন যে ঘোড়া নির্ঘাত বাজী হারবে।' সেই টিপ অনুযায়ী বাঁধা-বরাদ্দ-মত টাকার বাজী ধরে অশোক, ওটা তার মাসিক খরচার ফর্দে একটা বাঁধা আইটেম। বরাদ্দর এক নয়াপয়সা ওপরে ওঠে না অশোক।'

'রিডিক্যুলস্! অদ্ভুত!' বললেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

তপোবন বলল, 'কিন্তু স্যার, ঐটেই অশোকের পক্ষে স্বাভাবিক। যে দিন অশোকের ব্যাক-করা ঘোড়া বাজী মারবে, সে দিনই ঘোড়-দৌড়ের মাঠকে পিঠ দেখাবে অশোক, জীবনে আর ওমুখো হবে না।'

শুনে অনিমেষ রায়ের মনে হল এ ছেলেব উপযুক্ত স্থান হচ্ছে রাঁচির কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠান। মুখে এতদূব না এগিয়ে বললেন, 'এত ছিট্ তোমাদের অশোকের মাথায় ?'

'হ্যাঁ, স্যার। ছিটের অভাব নেই অশোকের মাথায়। নইলে আজ আমি কোথায় থাকতাম, জানি নে,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'শুধু আমি তো নই, আরো অনেকে। অনেকে।'

অনিমেষ রায় লক্ষ্য করলেন আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে তরুণ সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশীর কণ্ঠ। পরিষ্কার বুঝলেন অশোক কাঞ্জিলালের মাথার ছিট্‌কে সে মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, শুধু নিজের জন্যেই নয়, ঐ ছিটের কাছে ঋণী আরো অনেকের তরফ থেকে।

'দুঃখ একেবারে সইতে পারে না অশোক। তা নিজেরই হক, বা পরেরই হক,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'কিন্তু থাক অশোকের কথা। আপনি হয়তো ভাবছেন এ আমার বন্ধুকৃত্য, অতিকৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বা অন্ধপ্রীতির বাড়াবাড়ি।'

ঠিক তাই ভাবছিলেন অনিমেষ রায়, তাই অশোক কাঞ্জিলাল সম্বন্ধে তপোবন আর কিছু বলবে না জেনে তিনি খুশি হলেন। বছরের পর বছর পরীক্ষা এড়িয়ে যে একই ক্লাসে টিকে যাচ্ছে, সম্ভবত বাপের পয়সা আর প্রতিপত্তি আছে বলেই কলেজ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে না, তার প্রতি প্রসন্ন মনোভাব অনুভব করা সম্ভব নয় অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের পক্ষে।

অশোকপ্রসঙ্গকে ভালোভাবে ধামা-চাপা দেবার জন্য অনিমেষ রায় বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলার সম্মেলনটা তুমি "সংবাদ-হরকরা"র জন্যে "কভার" করবে বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী। 'সবগুলো বক্তৃতার চুম্বক মিলিয়ে একটা জোরদার লেখা লিখতে হবে আমাদের আসন্ন "মহাপ্রলয় সংখ্যা"-র জন্যে। পরশু বিকেলেই বাজারে বেরিয়ে যাবে।'

'পরশু বিকেলেই বেরিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল তপোবন। 'প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, বিজ্ঞাপন সব ছাপা হয়ে গেছে—সব প্রলয়ের ওপর। জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবার পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ কিনা ফুল-ফিগার ছবির হাফটোন-ব্লকও ইমিটেশন আর্ট-পেপারে ছাপা হয়ে গেছে। আমার আজকের রিপোর্টটাই শুধু বাকি। ঐটে ছাপা হলে তারপর বই বাঁধাই হয়ে পরশু বিকেলের ভেতরেই বাজারে বেরিয়ে যাবে।'

'বিক্রি হবে?'

'লাইক হট্ কেক্‌স্, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'মনে

করুন, গঙ্গার ইলিশ এখন বাজারে দু'টাকা সেরে ছাড়লে যা হবে। আমরা তো কম্পোজ ভাঙবো না, স্ট্যাণ্ডিং রেখে দেব। আবার ছাপতে হতে পারে। অবশ্য বিক্রি না হলেও মারা পড়বে না আমাদের "সংবাদ-হরকরা"; এ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন পেয়েছি পাঁচ হাজার টাকার। আমাদের কাগজ আপনার কেমন লাগে স্যার?'

'আমি কখনো পড়ি নি, তপোবন। নামও এই প্রথম শুনলাম। অথবা আগে শুনে থাকলেও মনে নেই।'

অনিমেষের কথা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠল সংবাদ-হরকরার প্রধান সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী। বাংলার প্রিয়তম সাপ্তাহিকের নাম শুনেছেন কি-না মনে নেই অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের! কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল ইনি দর্শনের অধ্যাপক। কেটে গেল চমক। দর্শনে যাঁরা ডুবে থাকেন তাঁরা দর্শন করেন কম, এই বোধহয় তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।

ঘুরে ঘুরে অনিমেষ আর রীতাকে অনেক কিছু দেখাল তপোবন পাকড়াশী। এই মহাসম্মেলনের পাণ্ডাদের সঙ্গে তার বেশ দহরম-মহরম আছে, বুঝলেন অনিমেষ রায়। রীতাও বেশ খুশি হল অনেক কিছু দেখে। রামধুন-মুখরিত মস্ত মণ্ডপের শ-দেড়েক গজ দূরে শুরু হয়েছে কয়েক সারি ফাঁকা স্টল অর্থাৎ দোকান বসাবার কামরা। সেগুলো সব আগাম ভাড়া হয়ে গেছে। 'প্রলয়-সপ্তাহ' পার হয়ে গেলে যে পণ্যশিল্প প্রদর্শনী শুরু হবে, এগুলো তারই অঙ্গ হিসেবে আগাম খাড়া করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনদাতারা কিন্তু এই প্রলয়-সপ্তাহেরও সুযোগ নিয়েছেন। মণ্ডপের চার ধারে শোভা পাচ্ছে নানা রকমের বিচিত্র, সচিত্র ও অচিত্র বিজ্ঞাপন।

আরো অনেক কিছু দেখে খুশি হল রীতা। নাও হতে পারত,

কিন্তু দেখিয়ে (এবং সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা করে) খুশি করার শিল্পে পাকা শিল্পী তপোবন পাকড়াশী।

বেলা তিনটে যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, কিছু কিছু করে ততই লোকের সমাগম হতে লাগল। তপোবন বলল, 'চলুন স্যার এবার মণ্ডপের ভেতর অগ্নিবাবার বেদীর কাছে। নইলে পরে হয়তো খুব সামনে জায়গা পাবেন না।'

তপোবনের সঙ্গে রীতাকে নিয়ে বেদীর অদূরে দাঁড়ালেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। দেখলেন একটু একটু করে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ছুটির দিন নাই বা হল, ভিড় জমাবার লোকের অভাব হয় নি। বেদী থেকে খানিকটা দূরে বৃত্তাকাব হোমকুণ্ডে হোমাগ্নি জ্বলছে। হোমাগ্নি ঘিরে উপবিষ্ট কয়েক জন লোক মাঝে মাঝে তাতে ঘৃত ইন্ধন যোগাচ্ছে একটি টিন থেকে তুলে নিয়ে নিয়ে। কান খাড়া রেখে আশেপাশের মানুষদের বিচিত্র কথোপকথন শুনতে লাগলেন অনিমেষ রায়ঃ

'হোমকুণ্ডে কি চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলে মশায় ?'

'চব্বিশ ঘণ্টা, বারুণের চিতার মত, কামাই নেই। এ দিকে হোমাগ্নি, ও দিকে রামধুন।'

'রোজ ক মন ঘি পোড়ে ?'

'বিস-পচাস মণ তো জরুর হোগা।'

'ঈস্ !!! হাজার হাজার টাকাব ঘি পুড়বে যে।'

'তা তো পুড়বেই। পৃথিবীকে বাঁচাতে গেলে ঘিয়ের মায়া করলে চলবে কেন ? পৃথিবীই যদি লোপাট হয়ে যায় তাহলে ঘি দিয়ে আপনি করবেন কী ?'

একটু পরেই মণ্ডপের প্রধান তোরণের বাইরে একটা সোৎসাহ কলরব শোনা গেল। একটা মস্ত মোটরগাড়ি শ্রুতিমধুর হুঙ্কারধ্বনি শোনাতে শোনাতে এসে থামল। তার পিছনে আরো কয়েকখানা।

ভক্তপরিবৃত হয়ে গাড়ির অভ্যন্তর থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হলেন এক দীর্ঘকায় প্রশস্তদেহ শ্বেতশ্মশ্রুগুম্ফ-সমন্বিত পীতাম্বর পুরুষ, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, পায়ে রক্তবর্ণ নাগরা, মুখে প্রশান্ত গম্ভীর সুধাহাস্য-জ্যোতি। একাধিক কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'জগদ্গুরু অগ্নিবাবা-কী জয়!' সঙ্গে সঙ্গে ও ধারে রামধুন-সঙ্গীত আরো জোরাল হয়ে উঠল।

ধীর গম্ভীর মহাপুরুষোচিত পদক্ষেপে এসে বেদীতে বসলেন অগ্নিবাবা। প্রসন্ন সহাস্য দৃষ্টিতে তাকালেন সমাগত সবার দিকে। রীতা খুশি হয়ে বলল, 'ইনিই মন্তর দিয়ে আগুন জ্বালবেন—না বাবা?'

'হ্যাঁ,' বললেন অনিমেষ রায়। আশেপাশে আর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন যেন মন্ত্রবলে কোথা থেকে অনেক নতুন মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে, তারা সবাই যেন দু চোখ দিয়ে অগ্নিবাবার দিব্যজ্যোতির সুধা পান করছে। সবার চোখে অসীম শ্রদ্ধা, অসীম বিস্ময়, অসীম বিশ্বাস, অসীম নির্ভর। তাঁর মনে হল পৃথিবীকে ধ্বংস করবার জন্যে যতগুলো গ্রহ অনন্ত শূন্যের বুকে একসারিতে এসে দাঁড়িয়েছে, এদের বিশ্বাস এই জগদ্গুরু তাদের সমবেত শক্তিকে পরাজিত করে পৃথিবীকে রক্ষা করবার নিশ্চিত ক্ষমতার অধিকারী, অগ্নিবাবার অভয় পেলে আর কোনো ভয় নেই।

অগ্নিবাবার আসনের সামনে পোড়ামাটির তৈরি একটা মস্তবড় ধুনুচির ওপর নারকেলী ছোবড়ার স্তূপ, তার ওপর ধূপচূর্ণ ছড়ান। অগ্নিবাবা সেই ধুনুচির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে কিছুক্ষণ নীরবে ধ্যান করলেন, তারপর উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করলেন। অনিমেষ রায় যা শুনতে পেলেন তাতে তাঁর মনে হল অগ্নিবাবা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন: 'ওম্ অগ্নয়ে নমঃ! ওম্ অগ্নয়ে নমঃ! ওম্ অগ্নয়ে নমঃ! ওম, ওম, ওম্।' মন্ত্র উচ্চারণ করেই ধুনুচির ওপর দুটি হাত সজোরে ঝাঁকিয়ে

যেন অদৃশ্য বাণ মেরে দিলেন অগ্নিবাবা, তারপর তিনি শুধু একবার ফুঁ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই ধুনুচির বুকে ছোবড়াগুলির ওপর দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল, আর সত্যিই ছড়াতে লাগল ধূপের ধোঁয়া। দেখে পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হল রীতা। কিন্তু পুলকিতও হলেন না, বিস্মিতও হলেন না অধ্যাপক অনিমেষ রায়। কলেজের ছাত্র ছিলেন যখন, তখন কতকগুলো রাসায়নিক ম্যাজিকের খেলা দেখাতে শিখেছিলেন তিনি ; যথা : ছুটি গ্লাস খালি দেখিয়ে মুখোমুখি রেখে রুমাল দিয়ে ঢেকে সিগারেটের ধোঁয়াকে মন্ত্রবলে ঐ খালি-দেখান গ্লাসের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। অনিমেষের মনে হল অগ্নিবাবার এই আগুন-জ্বালানটাও কিছুমাত্র অলৌকিক নয়, ম্যাজিকেরই একটা খেলা মাত্র। ধুনুচির ভেতর আগেই কোনো রাসায়নিক পদার্থ লুকিয়ে রাখা ছিল ঐ ধুনুচির ভেতর নারকেল-ছোবড়ায় ধূপের গুঁড়োর সঙ্গে লুকিয়ে। তারপর অগ্নিমন্ত্র পড়ে হাত ঝাড়বার ভান করে হাত থেকে অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ ঐ ধুনুচির ভেতর ফেলে দিয়েছিলেন অগ্নিবাবা, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই রাসায়নিকের মিশ্রণের ফলে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

বুজরুক! বুজরুক! ধাপ্পাবাজ প্রতারক এই মেকি হাস্যমুখ অগ্নিবাবা। এইসব মানুষ আসন্ন প্রলয়ের প্রচণ্ড ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান, মাত্রাজ্ঞান, এমনকি সাধারণ বুদ্ধি পর্যন্ত হারিয়েছে, তাই প্রসন্ন প্রশান্ত চেহারার এই বুজরুকের রাসায়নিক বুজরুকিকেও অলৌকিক অগ্নিমন্ত্রের লীলা বলে ভেবে নিচ্ছে। মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ এরা সবাই। এরা অম্লানবদনে মেনে নিচ্ছে এই বুজরুক লোকটিই তাদের পৃথিবীকে বাঁচাবে ধ্বংস থেকে, উলটে দেবে স্বয়ং বিশ্ববিধাতার বিধান!

হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপল অনিমেষ রায়ের, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—'কেমিকেল ম্যাজিক!' না, ঠিক উচ্চকণ্ঠে নয়, ধরা-ধরা গলায়। উত্তেজনাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল বলেই

স্বরটা উচ্চ হতে পারে নি। ও দিকে তখন অগ্নিবাবা উদাত্তকণ্ঠে সুর করে একটা গুরুগম্ভীর স্তোত্র আবৃত্তি শুরু করেছেন। তাঁর অল্পদূরে বাঁ ধারে মাথায় ছ্যাঁদা-ওয়ালা একটা বাক্স—চিঠির বাক্সের মত—তার বুকে লেখা ঃ

পৃথিবীরক্ষা ভাণ্ডার

আপনার সাধ্য ও রুচি অনুযায়ী দান করুন

বাক্সের পিছনে একঝুড়ি 'গ্রহ-শান্তি মাদুলি' নিয়ে বসে আছেন 'গ্রহশান্তি মহাযজ্ঞ সম্মেলন'-এর মাদুলী-বিভাগের সম্পাদক স্বয়ং, তাঁর পাশে একটি উচু খুঁটিব মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা ঃ

গ্রহ-শান্তি মাদুলী

প্রণামী—সওয়া পাঁচ আনা মাত্র

'আসুন, স্যার!'—বলে আর বাক্যব্যয় না করে এবং করতে না দিয়ে তপোবন পাকড়াশী যেন একরকম তড়িৎগতিতেই হিড়হিড় করে টানতে টানতে মণ্ডপের একেবারে বাইরে নিয়ে এল অনিমেষ রায়কে আর রীতাকে। অগ্নিবাবার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি জনতার এ দিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসত বা গরজ ছিল না।

বাইরে এসে তপোবন বলল, 'একি সর্বনাশ করবার উপক্রম করেছিলেন স্যার? আপনাকে যে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পাঠাতে হত!'

হতভম্বের মত অনিমেষ রায় প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

'অগ্নিবাবাকে আপনি বুজরুক ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন ? আপনার এই ধৃষ্টতা টের পেলেই ভক্তেরা যে আপনাকে চাঁদা করে তুলো ধুনে দিত, স্যার। আপনার মত কাণ্ড করতে গিয়েই দুই ভদ্রলোক এখন হাসপাতালে আছেন। বোধহয় হপ্তাদুয়েক থাকতে হবে।'

'কিন্তু তাই বলে চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত বুজরুক—' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অনিমেষ রায়।

'বুজরুক নয়, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'জগদ্‌গুরু, অবতার, মহাপুরুষ, অলৌকিক ক্ষমতাশালী সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এঁর দেদার ভক্তশিষ্য, ক্ষমতায় আর পয়সায় বিরাট, তাঁরা যে এঁরি কথায় উঠবেন বসবেন।'

'তপোবন, তুমি কি বলতে চাও অগ্নিবাবা—'

'আগুন নিয়ে খেলতে না যাওয়াই ভাল, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'অগ্নিবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিচিত্র বিবরণ আমাদের সংবাদ-হরকরার মহাপ্রলয়-সংখ্যায় পাবেন। এক কপি আমি দেব স্যার আপনাকে। ওটা ছদ্মনামে আমারই লেখা। এ দিকে আসুন, স্যার।'

বলে তপোবন পাকড়াশী যে দিকে নিয়ে চলল, সে দিকে তাকিয়ে অনিমেষ রায় দেখলেন : 'গ্রহশান্তি-কেবিন।'

'একটু বিশ্রাম করা আর চা-টা খাওয়া যাক, স্যার,' বলল তপোবন। 'আপনারা নিশ্চয় শ্রান্ত হয়েছেন।'

কেবিনে ঢুকে তিন জনে বসে তপোবন ফরমায়েশ করল চা এবং প্রত্যেককে গ্রহশান্তি চপ আর কাটলেট একখানা করে দিতে।

অনিমেষ জানতে পারলেন গ্রহশান্তি-কেবিনের নেপথ্যে কালোবরণ মাইতিরই মগজ, এবং কাফে-ডি কলেজের কলেজ চপ

আর কাটলেটই এখানে নাম পাল্‌টে হয়েছে গ্রহশান্তি চপ আর কাটলেট।

যথাকালে বিল এল। বিল চুকিয়ে দিল তপোবন। অনিমেষ রায়কে খুলতে দিল না মনিব্যাগ।

'একই কথা,' বললেন অনিমেষ রায়। 'পৃথিবীই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে এ হপ্তায়।'

শেষের কথাটায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল তপোবনের। সে বলল, 'আজ রাতেই "যাদুমহল"-এ ফুজিয়ামা আর ভানুমতীর শেষ যাদু-প্রদর্শনী। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন নি স্যার—"বিদেশ-যাত্রার প্রাক্‌কালে অদ্যই শেষ রজনী" ?'

'খেয়াল করি নি, তপোবন।'

'ফুজিয়ামার আর ভানুমতীর—অন্তত ভানুমতীর ম্যাজিক আপনি "যাদুমহল"-এ নিশ্চয় দেখেছেন স্যার ?'

'না তপোবন, দেখি নি।'

'সর্বনাশ !' বলল তপোবন পাকড়াশী। তার কথার সুরে মনে হল ফুজিয়ামা আব ভানুমতীর ম্যাজিক পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, এ জিনিস না দেখার চাইতে বড় ট্রাজেডি আর নেই।

'সর্বনাশ !' বলল সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশী। 'তাহলে তো আজই আপনার লাস্ট চান্‌স্‌, মানে শেষ সুযোগ। এ সুযোগ হারালে তো আর—' বলে থেমে গেল তপোবন।

'কোনো দিন দেখা হবে না।' তপোবনের অসম্পূর্ণ বাক্য এই বলে সম্পূর্ণ করে দিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। আর মনে মনে ভাবলেন : 'এইমাত্র তো দেখলাম অগ্নিবাবার ম্যাজিক। ফুজিয়ামা আর ভানুমতী কি এঁর চাইতেও পাকা ম্যাজিশিয়ান ?' কিন্তু মনের কথাটা চেপে রাখলেন মনেরই ভেতর। তারপর আবার ভাবলেন : 'আর কটা দিন বাদে কোথায় থাকবে যাদুকর ফুজিয়ামা, আর

কোথায় থাকবে অতুলনীয়া যাতুকরী ভানুমতী? অসংখ্য অণুতে বিভক্ত হয়ে ভেসে বেড়াবে অনন্ত শূন্যে।'

'কিন্তু সে যে কত বড় লোকসান তা আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না, স্যার,' বলল তপোবন। 'রাতের পর রাত, রাতের পর রাত, রাতেব পর রাত হাউস ফুল যাচ্ছে। "যাতুমহল"-এর ইতিহাসে এমন বিস্ময়কর যাতুর সমাবেশ আব কখনো দেখা যায় নি। বিশ্বের যাতুজগতে যাতুপ্রদর্শনীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব যুগান্তর এনে দিয়েছেন ফুজিয়ামা আর ভানুমতী। একই সময়ে একই আকাশে পাশাপাশি এমন বিরাট, এমন উজ্জ্বল তুটি জ্যোতিষ্কের উদয় পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো দেখা যায় নি, স্যার। ঘুঘু সাংবাদিক হলে কি হবে স্যার, আমাব মগজে এমন ভাষা নেই যাতে সিকিভাগের সিকিভাগও আপনাকে বলে বোঝাতে প্যারি ওঁরা কী আশ্চর্য, কী অতুলনীয়, কী অবিস্মরণীয়! আপনি কি এঁদের নামও শোনেন নি স্যার?'

'হয়তো শুনে থাকব, কিন্তু খেয়াল করি নি, তাই মনেও নেই,' বললেন দর্শনেব অধ্যাপক অনিমেষ রায়। 'তাছাড়া—তুমি হয়তো জানো না তপোবন, জানবেই বা কি করে?—আমি দর্শন নিয়ে এত ব্যস্ত যে ওসব হাল্কা আমোদপ্রমোদ নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসতই মেলে না।'

'হাল্কা???' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'আমি সাংবাদিক, গভীরতার ধার বড় একটা ধারি নে, কিন্তু জীবনে শুধু ওজনটাই কি বড় স্যার?'

এ প্রশ্নের জবাব চট্ করে দিতে পারলেন না অনিমেষ রায়। এ প্রশ্ন এমনভাবে কেউ তাঁকে করেও নি কখনো। প্রশ্নটা চট করে একটা যেন খটকা লাগিয়ে দিল তাঁর মনে। তিনি ভাবতে লাগলেন, ভাবতে লাগলেন, ভাবতেই লাগলেন।

'কিন্তু না, এঁদের যাদু শুধু হাল্‌কা নয়, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'আপাত-হাল্‌কা সেই অনায়াস যাদুর আড়ালে আছে গভীরতা, আছে ওজন, যা আমি জানি আপনাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করবে। আপনি দেখেন নি, কি করে বুঝবেন সে যে কী অপূর্ব জিনিস?' বলে আবৃত্তি করল ঃ

'কী যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী-বিষে
দংশেনি যারে।'

উপমাটা হয়তো খুব জুৎসই হল না, কিন্তু ওর চাইতে ভাল উপমা চট করে মনেও পড়ল না সাংবাদিক তপোবন পাকড়াশীর।

বেচারাকে একটু খুশি করতে ইচ্ছে হল অনিমেষ রায়ের। বললেন, 'আমারই বরাত খারাপ, তপোবন, এ জিনিস দেখি নি, দেখতেও পাবো না কোনো দিন।' দুঃখের খাটি সুর লাগল তাঁর কথায় : সে দুঃখ তাঁর নিজের জন্যে নয়, কন্যা রীতার জন্য। "যাদুমহল"-এ রাতের পর রাত অতুলনীয় যাদুর খেলা দেখিয়ে অসংখ্য মানুষকে বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ করে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়েছেন ফুজিয়ামা আর ভানুমতী, রীতা যা দেখলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, কিন্তু দর্শনে অন্ধ থেকে তিনি মেয়েটাকে একদিনও নিয়ে যান নি "যাদুমহল"-এ যাদু দেখাতে। আর আজই শেষ রজনী। এবং কয়েক দিন বাদেই পৃথিবীরও শেষ।

'আমি ফুজিয়ামা আর ভানুমতীর ম্যাজিক দেখব, বাবা,' বলল রীতা। জগদ্‌গুরুর আগুন-জ্বালান দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে রীতার মন।

'চল, যাব। অবশ্য যদি টিকেট পাই।'

'পাবেন না। সাত দিন আগে সমস্ত টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে।

কিন্তু এই নিন।' পকেট থেকে দুখানা টিকেট বার করে অনিমেষ রায়ের হাতে দিল তপোবন। 'রেখেছিলাম, কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমিই যাব, এই ভেবে,' বলল তপোবন। 'কিন্তু আমার তো যাওয়া সম্ভব নয়, আজকের এই বৈঠকের ভাষণগুলো সব ভাল করে শুনে "কভার" করতে হবে। কাউকে দিয়ে দেব ভাবছিলাম, তার আর দরকার হল না। রীতাকে নিয়ে আপনি যান স্যার, তাহলে আমার মনে আর কোনো দুঃখ থাকবে না। না না, টাকা আমি নেব না, স্যার। এমনিতেও নিতাম না, তার ওপর ও টিকিট আমি তো পয়সা দিয়ে কিনি নি।'

'তবে?'

'দিদি দিয়েছেন। মানে, যাদুসম্রাজ্ঞী ভানুমতী। ওঁকে আমি দিদি বলি কিনা। অশোক কাঞ্জিলালও।'

'অশোক কোথায় এখন? কোনো ক্লাসে সে কামাই করে না, কিন্তু আমার গত ক্লাসে তাকে দেখি নি।'

'ঠিক কোথায় তা আমিও বলতে পারি নে, স্যার,' বলল তপোবন। 'কাফে-ডি-কলেজে কালোবাবুর মুখে শুনলাম সমুদ্রের ধারে কোথাও হঠাৎ বেড়াতে চলে গেছে। একখানা চিঠিও রেখে গেছে কালোবাবুর কাছে, সে চিঠি কার জন্যে তা বলেন নি কালোবাবু। বলবার হুকুম নেই। বরাবরই এমনি খেয়ালী অশোক। আপনারা তাহলে এখনই রওনা হয়ে যান, স্যার। গিয়ে, খেলা শুরু হবার আগে কিছুক্ষণ সময় থাকবে। তখন হলের বাইরে লবিতে অনেক কিছু দেখতে পাবেন। দেখে খু—ব খুশি হবে রীতা।'

'কিন্তু তপোবন, ফিরতে রাত হলে বাড়িতে রীতার মা চিন্তা করবেন যে।'

'আপনার বাড়িতে বা কাছাকাছি ফোন নেই, স্যার?'

'আমার ওপরতলায় আছে বাড়িওয়ালার ফোন।'

'তাহলে তো কোনো অসুবিধেই নেই, স্যার। "যাদুমহল"-এর লবিরই একধারে পাবলিক ফোন-বুথ আছে, সেখান থেকে বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দেবেন। আসুন, আপনাদের একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিই।'

কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি মিলল। ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন রীতাকে নিয়ে অনিমেষ রায়। বললেন, 'অপূর্ব বিস্ময় দেখতে চলেছি, দেখাতে চলেছি রীতাকে, কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব জানি নে। কিন্তু তোমাকে যে বঞ্চিত করলাম, তপোবন—'

'বঞ্চিত নয়, ধন্য হলাম আমি,' বলল তপোবন। 'আজকের এই যোগাযোগের জন্যে ভগবানের কাছে আমি চিরদিনের জন্যে ঋণী হইলাম, স্যার। আর, আমি তো আগের অনেক রজনীই দেখেছি, স্যার। নাই-বা দেখলাম শেষ রজনী।'

'নাই-বা দেখলে ভানুমতী-ফুজিয়ামার শেষ রজনী,' ভাবলেন অনিমেষ রায়। 'কিন্তু হু-হু করে ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীর শেষ রজনী। সেই শেষ রজনী তো তোমাকে দেখতেই হবে, তপোবন।'

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিটারের নিশান নামিয়ে দিয়ে প্রতীক্ষা করছিল রওনা হবার ইশারার।

তপোবন বলল, 'আমরা সবাই, মানে রাজমোহিনী কলেজের সব ছাত্রছাত্রী, এমনকি কাফে-ডি-কলেজের কান্তোবাবু, সবাই স্যার আপনাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি।'

ট্যাক্সির একটা দরজা শক্ত করে ধরে এই কথা বলল তপোবন, যেন তার ভয়, তার এই কথাটা স্যারকে শোনাবার আগেই পাছে ট্যাক্সিটা দুষ্টুমি করে ছুট লাগায়।

এই কথাটা শোনাবার জন্যে ট্যাক্সি ধরে রেখেছে তপোবন পাকড়াশী! বড় বিস্ময় জাগল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের মনে। তিনি মনের বিস্ময় মনেই গোপন রাখবার সাধ্যমত চেষ্টা করে

যথাসাধ্য স্মিতমুখে শুধালেন, 'তার কারণটা জানতে পারি কি, তপোবন ?'

তপোবন বলল, 'তার একটি কারণ—আপনি।'

'আরেকটি ?'

'অশোক কাঞ্জিলাল।'

উচ্চারণ শুনে অনিমেষ রায়ের মনে হল দু নম্বর কারণটাই প্রধান। অর্থাৎ তাদের সবার 'হিরো' অশোক কাঞ্জিলাল তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দ্যাখে বলেই তারাও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দ্যাখে, অন্তত সেইরকম ভান করে।

'প্রলয়-নিবারণী মাদুলী বিতরণটা দেখে গেলেন না, স্যার,' বলল তপোবন পাকড়াশী। 'তা হক, মাদুলী বিক্রি তো চলবে আরো কটা দিন। ট্যাক্সিওয়ালা ভাই, এই রাস্তায় সোজা চলে যাও "যাদুমহল"।'

"যাদুমহল" অভিমুখে ছুটে চলল ট্যাক্সি।

ও দিকে সেই সময়ে অনিমেষ রায়ের বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল শঙ্কর দত্তের মস্ত স্টুডিবেকার গাড়ি। নেমে এলেন কাঞ্জিলাল এঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশন-এর চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত, সঙ্গে তাঁর মেয়ে ললিতা, রীতার বয়সী এবং রীতার সহপাঠিনী। গেট খুলে আগে ঢুকে গেল ললিতা, তার অনুসরণ করলেন চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত।

'মাসিমা!' ডাকল ললিতা। বাইরের ঘরেই বসে ছিলেন হিমানী রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়ছিলেন বসে বসে। এ সময়ে ললিতার গলা শুনে একটু বিস্মিত হলেন, আনন্দিতও। মেয়েটাকে ভালো লাগে তাঁর, অনেকটা নিজের মেয়ের মত। বললেন, 'এসো, ললিতা। এই-যে আপনিও এসেছেন, মিঃ দত্ত। কী সৌভাগ্য আমার!'

শঙ্কর দত্ত বেশ গুছিয়ে একটা জুৎসই জবাব দেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু জবাবটা ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিলেন না। হিমানীর কাছে প্রায়ই তাঁর আসতে ইচ্ছে হয়, কাছে আসবার কোনো শোভন অজুহাতই হাতছাড়া করেন না, কিন্তু এলেই তাঁর বিপদ হয় হিমানীর সঙ্গে যেমন করে কথা বলতে পারা উচিত বলে তাঁর মনে হয়, তেমনটি তিনি পেরে ওঠেন না। এবং না-পাবার লজ্জায় এবং বেদনায় মন ভরে ওঠে তাঁর।

এ যাত্রা তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে ললিতা বলল, 'বীতা কোথায় মাসিমা? বীতা আজ স্কুলে যায় নি কেন? ও তো কখনো কামাই করে না, তাই আমি ভেবে বাঁচি নে।'

'ললিতার কাণ্ড আর কি বলব আপনাকে, মিসেস রায়,' হেসে বললেন শঙ্কর দত্ত, চীফ এঞ্জিনীয়ার। 'আজ একটু আগে ফিরেছি কারখানা থেকে। এত আগে ফিরি নে বড় একটা, আজ হঠাৎ কী মনে হল। ললিতা তার অনেক আগেই ফিরে এসেছে স্কুল থেকে —ওকে স্কুল থেকে বাড়ি এনে দিয়েই গাড়ি ফিরে গেছে আমার কাছে কারখানায়।' আমি ফিরতেই ললিতা বললে, 'বাবা, চল দেখে আসি বীতা আজ এল না কেন। টানতে টানতে নিয়ে এল আমাকে।'

শেষ বাক্যটিতে বেশ একটু অতিরঞ্জন ছিল। আগের বাক্যগুলিও নির্জলা সত্য নয়। তিনি এসেছিলেন তাঁর নিজেরই দুরন্ত আগ্রহে —হিমানীর কাছে আসবার এই একটি চমৎকার অজুহাত ব্যর্থ হতে দিতে চান নি।

'খুব ভাল করেছে। নইলে কি আর আপনি আসতেন? ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। বোসো, ললিতা।'

বসলেন শঙ্কর দত্ত। বসল ললিতা।

ললিতা বলল, 'কিন্তু বীতা কোথায়, মাসিমা?'

'তুমি যেমন তোমার বাবার সঙ্গে বেরিয়েছ, রীতাও তেমনি তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে, ললিতা।'

'কিন্তু স্কুলে যায় নি কেন?'

'ওর বাবার কলেজ বন্ধ বলে ওর বাবাই যেতে দেন নি।'

ঠিক এমনি সময় ওপরতলা থেকে নেমে এল বাড়িওয়ালার ঝি। 'গিন্নীমা বললেন পোফেছারবাবু ফোনে ডাকছেন আপনাকে। এখ্খুনি আসুন।'

হঠাৎ অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল হিমানীর মন। বাইরে থেকে স্বামীর টেলিফোন-আহ্বানও তাঁর জীবনে এই প্রথম। কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? 'আপনারা একটু বসুন দয়া করে। দেখে আসি উনি ফোন করছেন কেন।'

শঙ্কর দত্তকে আব ললিতাকে বসিয়ে রেখে ছুটে ওপরে চলে গেলেন হিমানী রায়। মুগ্ধনেত্রে তাঁর চলে যাওয়ার অনুপম ভঙ্গিটুকু লক্ষ্য করলেন 'কাঞ্জিলাল এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন'-এর চীফ এঞ্জিনীয়াব। একটা দীর্ঘশ্বাস বেবিয়ে এল তাঁব বুকের ভেতর থেকে।

ওপরে দ্রুতপায়ে উঠে গিয়ে কাঁপা হাতে ফোন ধরে হিমানী বললেন, 'হ্যালো!'

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে অনিমেষ রায় বললেন, 'হিমানী? রীতাকে "যাদুমহল"-এ ফুজিয়ামা আর ভানুমতীর ম্যাজিক দেখাতে এনেছি। ফিরতে হয়তো পৌনে নটা কিংবা নটা হবে।'

হিমানীর বুক থেকে একটা বিবাট আতঙ্কের বোঝা নেমে গেল। তিনি ধন্যবাদ দিলেন ভগবানকে মনে মনে।

'তুমি ভাল আছ তো? তোমার জন্যে ভাবছি,' বললেন অনিমেষ রায়।

'কিচ্ছু ভেবো না, আমি খুব ভাল আছি,' বললেন হিমানী

রায়। 'খারাপ থাকবার তো কোনো কারণ নেই'। একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম মাত্র। তাই বেরোলাম না তোমাদের সঙ্গে। রীতা খুশি হয়েছে তো?'

'সেটা রীতার মুখেই শোনো,' বললেন অনিমেষ রায়।

রীতা বলল, 'অগ্নিবাবার ম্যাজিক দেখেছি, মা। ভা—রী অবাক কাণ্ড। দেশলাই-টেশলাই কিচ্ছু লাগে না, শুধু মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়েই আগুন জ্বালান অগ্নিবাবা। এবার ফুজিয়ামা আর ভানুমতীর ম্যাজিক দেখব। আজই শেষ।'

শেষ! শেষ! শেষ! মেয়েটাকেও কি তার বাবার 'শেষ'-ব্যামোতে ধরল নাকি? ভাবলেন হিমানী রায়।

'তুমি দেখতে পাবে না বলে মন-খারাপ লাগছে, মা,' বলল রীতা।

মেয়ের মন-খারাপের কথা শুনে খুশি হল হিমানীর মাতৃহৃদয়। 'না না, মন-খারাপের কী হয়েছে, রীতা? তুমি এলে পরে তোমার মুখ থেকে আমি স—ব শুনব,' বললেন হিমানী। 'আর শোনো, রীতা। এ দিকে—'

'এ দিকে কী মা?' ও দিক থেকে প্রশ্ন এল রীতার।

হিমানী বলতে যাচ্ছিলেন এ দিকে বাড়িতে রীতার খোঁজে এসে হাজির হয়েছে ললিতা তার বাবাকে নিয়ে। কিন্তু বলতে গিয়েও খবরটা চেপে গেলেন তিনি। ললিতাকে 'ভয়ংকর' ভালবাসে রীতা, তাই যদি জানে ললিতা এসে তাকে না পেয়ে চলে গেল, তাহলে মন-খারাপ হবে রীতার, ম্লান হয়ে যাবে "যাদুমহল"-এ ম্যাজিক দেখার অনেকখানি আনন্দ। তাই বললেন, 'এ দিকে আমি বেশ চুপচাপ বিশ্রাম করে চাঙ্গা হয়ে নেবো। তারপর তোমরা এলে তোমাদের মুখে ম্যাজিকের সব গল্প শুনতে হবে তো?'

জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল রীতা, কিন্তু হঠাৎ সংযোগ ছিন্ন

হয়ে গেল ও দিক থেকে। 'হ্যালো! হ্যালো!' বললেন হিমানী। সাড়া নেই। রিসিভার রেখে দিলেন পরম নিশ্চিন্ত মনে।

পাশের ঘরেই বিছানায় শুয়ে উজ্জ্বলকুমার, পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিরক্ত। ডাক্তারের ওপর। বাবার ওপর। পায়ে চোট লেগেছে, পায়ে ব্যাণ্ডেজ, সেইজন্যে পুরো শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে রাখার কোনো মানে হয়?

নিচে নেমে আসছিলেন যখন, উজ্জ্বল শুধাল, 'ফোনে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন মাসিমা?'

'তোমার মেসোমশাই, আর রীতা। ওরা ম্যাজিক দেখতে গেছে "যাদুমহল"-এ। আর এদিকে রীতার খোঁজে এসেছে—কে বল তো?'

'কে? বলুন না, মাসিমা।'

'ললিতা। ওর বাবাকে নিয়ে।'

'কতক্ষণ থাকবে?'

'কতক্ষণ আর?' বললেন হিমানী রায়। অর্থাৎ: 'বেশিক্ষণ থাকবে বলে তো মনে হয় না।'

কী যেন ভাবল উজ্জ্বল একটুক্ষণ। তারপর বলল, 'ললিতাকে একটু ওপরে পাঠিয়ে দেবেন মাসিমা? একটু গল্প করব ওর সঙ্গে।'

'আচ্ছা,' বললেন হিমানী। তারপর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। মনে হল বহুক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন দু জন অতিথিকে। আগে যেখানে বসে ছিলেন সেইখানেই বসতে বসতে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন, 'বসিয়ে রাখলাম অনেকক্ষণ। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার দত্ত।'

শঙ্কর দত্ত এতক্ষণ ধরে বসে বসে হিমানীর রেখে-যাওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সংগ্রহ গ্রন্থটির পাতা উলটে দেখছিলেন। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি মিনিট বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। সত্যিই

তাঁর মনে হল, বহুক্ষণ বাদেই ফিরে এসেছেন হিমানী। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না, তাই বললেন, 'না না, সেকি কথা? মনে করবার কী আছে? অবশ্য একটু উদ্বেগ বোধ করছিলাম তা ঠিক। কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে উদ্বেগের কোনো কারণ ঘটে নি।'

হিমানী স্মিতমুখে বললেন, 'ঠিকই আন্দাজ করেছেন আপনি।'

শঙ্কর দত্ত বললেন, 'তবু একটু উদ্বেগের কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে মনের ভেতর। ফোনের সংবাদটা জানতে পারি কি? অবশ্য যদি আমাকে জানাবার মত হয়।'

বাঃ এই তো জড়তা কাটিয়ে বেশ কায়দা করে কথা কইতে পারছেন তিনি। মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিলেন চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত।

'আপনাকে জানাবার মত বইকি,' বললেন হিমানী রায়। 'না-জানাবার মত কিছু নয়। উনি "যাদুমহল"-এ ম্যাজিক দেখতে গেছেন মেয়েকে নিয়ে। ফিরতে রাত নটা পৌনে-নটা হবে। এ খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যেই ফোন করছিলেন "যাদুমহল" থেকে।'

শঙ্কর দত্তর মনে হল এমন মিঠে খবর তিনি অনেক দিন শোনেন নি। মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন বিধাতাকে। শুধালেন, 'আমরা এসেছি জানিয়ে দিয়েছেন তো?'

'না। আর, কানেক্‌শনটাও হঠাৎ কেটে গেল ও ধার থেকে,' বললেন হিমানী রায়।

ওটা হিমানীর একটা পঙ্গু অজুহাত বলেই মনে ভাবলেন শঙ্কর দত্ত। বহুক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলেছেন হিমানী; শঙ্কর দত্ত এসেছেন, এ খবরটা দেবার ইচ্ছে থাকলে অনায়াসেই দিয়ে দিতে পারতেন অনিমেষ রায়কে। হঠাৎ টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা কিছু নয়; শঙ্কর দত্তের এই অপ্রত্যাশিত আগমন-সংবাদ হিমানী ইচ্ছে করেই গোপন রাখলেন অনিমেষ রায়ের কাছ থেকে।

বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন আগে, এবার কৃতজ্ঞচিত্তে হিমানীকে ধন্যবাদ দিলেন শঙ্কর দত্ত।

"যাতুমহল"-এর সান্ধ্য যাতুপ্রদর্শনী সাড়ে আটটার আগে কিছুতেই ভাঙবে না, জানেন শঙ্কর দত্ত। আজ বরং যবনিকা-পতন নটার কাছাকাছিও গিয়ে ঠেকবার সম্ভাবনা। সুতরাং অন্তত সাড়ে আটটা পর্যন্ত গৃহে হিমানীর অনিমেষহীন উপস্থিতি নিশ্চিত, এ খবর হিমানীই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। অতি সূক্ষ্ম কৌশলে। আশ্চর্য, অপ্রত্যাশিত সুযোগ করে দিয়েছেন বিধাতা, এবং সেই সুযোগ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন হিমানী নিজে। এখন সেই সুযোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব শঙ্কর দত্তের। এই তাঁর অগ্নিপরীক্ষা।

অদ্ভুত পরিহাস বিধাতার। শুধু অদ্ভুত নয়—নির্মম, হৃদয়হীন, দুরন্ত খামখেয়ালী। ভাবতে লাগলেন সারা ভারতের অন্যতম সেরা যন্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠান 'কাঞ্জিলাল এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন'-এর চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত। এখানকার এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা সমাপ্ত করে বিলেত থেকে এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা এবং ইউরোপীয় কারখানায় হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলেন তিনি বড়লোক শ্বশুরের পয়সায়। সেই শ্বশুরের একমাত্র কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করেই উচ্চশিক্ষা, অভিজ্ঞতা আর চাকরির বাজারে মহামূল্যবান ডিগ্রী নিয়ে আসবার জন্যে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছেলে শঙ্কর দত্ত। চোখ-ধাঁধান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ছাড়া আর-কোনো স্বপ্ন তখন ছিল না তাঁর চোখে। এখানকার পরীক্ষায় খুব বেশি নম্বর পেয়ে প্রথম হওয়াটা তাঁর সেই স্বপ্ন আর সাধনার ফল। তারপর এই হীরের টুকরো ছেলের জন্য বড়লোক শ্বশুরের খোঁজ করতে লাগলেন শঙ্কর দত্তের পুত্র-গর্বিত বাবা। অনেক বিবাহযোগ্যার বড়লোক বাবা ধর্না দিতে লাগলেন শঙ্কর দত্তের বাবা দ্বিজেন দত্তের কাছে। কারণ

কেউ আগে আর কেউ পরে টের পেলেন এ ব্যাপারে স্বয়ং পাত্র অর্থাৎ শঙ্কর দত্ত মগজ বা হৃদয় এতটুকু খাটাতে রাজি নন। বিয়ের বাজারে সবচেয়ে লাভজনক দাঁও মারার ভারটা তিনি সম্পূর্ণ তাঁর অভিজ্ঞ বাবার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

বাবার ব্যবস্থা অনুযায়ী অম্লানবদনে বড়লোকের মেয়ে মনোরমাকে বিয়ে করে বিলেত চলে গেলেন হীরের টুকরো ছেলে শঙ্কর দত্ত। এখানেই পাঁচশো-টাকা-মাইনের চাকরির 'অফার' পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নজর আরো উঁচু, তাই নেন নি সে চাকরি। বিলেত রওনা হবার আগে দ্বিজেন দত্ত একদিন কথায় কথায় ছেলেকে বলেছিলেন, 'অডিটর অমর চৌধুরীর সঙ্গে কথা প্রায় সেমিফাইনাল পাকা করে ফেলেছিলাম ওর মেয়েকেই পুত্রবধূ করে ঘরে আনব। খুবই ইচ্ছে ছিল চৌধুরীমশায়ের। কিন্তু মেয়ে ও দিকে কোন্ এক প্রাইভেট কলেজের লেক্‌চারারকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে বসে আছে। তাই চৌধুরীমশাই শেষ পর্যন্ত মাফ চাইলেন। অনিমেষ না কে এক ছোকরা অল্প-মাইনের প্রফেসর, তাকেই বাপের অমতে বিয়ে করেছে মেয়েটি। অমর চৌধুরী তারপর থেকে একরকম ত্যাজ্য কন্যাই করে রেখেছেন মেয়েকে। মেয়েটির নামটি আমার বড় পছন্দ হয়েছিল—"হিমানী।" '

শঙ্কর দত্ত বলেছিলেন, 'মনোরমা নামটাও হিমানীর চাইতে কিছু খারাপ নয়, বাবা।' হিমানীকে তখনো দেখেন নি তিনি।

তারপর ফিরে এলেন বিলেতের শিক্ষা সমাপ্ত করে। ঢুকলেন মোটা মাইনের চাকরির বাজারে। শেষে অলঙ্কৃত করলেন 'কাঞ্জিলাল এঞ্জিনীয়ারিং কর্‌পোরেশন'-এর চীফ এঞ্জিনীয়ারের অতি-লোভনীয় পদটি।

সুখেই ছিলেন, স্বস্তিতেও। রূপ বা কাল্‌চার নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত, এঞ্জিনীয়ারিং-এর ভিড়ে ফুরসৎ পান

নি বললেও চলে। প্রচুর দায়িত্ব, প্রচুর সম্মান, প্রচুর আয়, পরিশ্রমও প্রচুর। এতবড় পদের অধিকারী তিনি, অনেক বড় বড় পার্টিতে যেতে হত তাঁকে, অনেকক্ষেত্রেই সঙ্গে নিতে হত 'মিসেস দত্ত' অর্থাৎ মনোরমাকে। সেজন্যে মনোরমাকে কেতাদুরস্তও করে নিয়েছিলেন শঙ্কর দত্ত। তাঁরা দু জন, কন্যা ললিতা আর শিশুপুত্র দুলাল, এই চার জনের ছোট্ট সংসার বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন ভাগ্যদেবতা একটা প্যাঁচ কষলেন—ইলেক্‌ট্রিক শক লেগে মনোরমার চোখের অনতিদূরে চিৎকার করে মরে গেল দুলাল। বন্ধ করে দেওয়া গেল বিদ্যুৎতরঙ্গপ্রবাহ, কিন্তু জীবনের প্রবাহ ফিরিয়ে আনা গেল না শঙ্কর মনোরমার প্রিয়তম শিশুর দেহে।

বৈদ্যুতিক শকে মৃত্যু হল সেই শিশুর, আর মানসিক শকে সঙ্গে সঙ্গেই মনোরমা হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। হাসিকান্নার অতীত মানুষ যেন। চিৎকার করে কাঁদলেন না, অশ্রুও ঝরল না চোখ থেকে। যেন হারিয়ে ফেললেন ব্যক্তিত্ববোধ, স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ দেবার ক্ষমতা, শখ, আরো অনেক কিছু। সেরা সেরা ডাক্তার দেখান হল অনেক টাকা খরচ করে, হাওয়া-বদল করিয়ে আনা হল অনেক জায়গায়, কিছুতে কিছু হল না। শঙ্কর দত্ত সর্বশেষে শরণ নিলেন মগজের আর মনের ব্যাধির বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখরের।

তিনি এসে দেখে বললেন, এর পর আকস্মিক কোনো রকম শক পেলেই বিষে বিষক্ষয় হয়ে মনোরমার আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং দৈবের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। মাথায় বৈদ্যুতিক শক লাগিয়ে 'শক-থেরাপি' প্রয়োগ করলে নিরাময়ের সামান্য একটু সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু বিপরীত ফলের, এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কাও রয়েছে। মনোরমার জীবন বিপন্ন করে 'শক-থেরাপি' প্রয়োগের নিদারুণ ঝুঁকি

নিতে নিজের মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারেন নি শঙ্কর দত্ত। সেই থেকে দৈবের ওপর নির্ভর করে আছেন কিন্তু 'দৈব' এখনো দয়া করেন নি, করবেন বলে মনেও হচ্ছে না।

অবশ্য মনোরমা যে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে ছিলেন তা নয়। দাস-দাসীর অভাব ছিল না বাড়িতে, কাজ কিছুই তাঁকে দেখতে হত না। কিন্তু তিনি রুটিন-জীবন যাপন করে যেতেন যেন প্রাণহীন, যন্ত্রচালিত 'রবট্'-মানুষের মত, তাঁর সাহচর্যে জীবিত মানুষের সাহচর্য পাচ্ছেন বলে মনে হত না শঙ্কর দত্তের।

তারপর একদিন—খুব বেশি দিনের কথাও নয়—কন্যা ললিতার সঙ্গে এলোমেলো নানা কথা বলতে বলতে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানতে পারলেন ললিতার সহপাঠিনী বীতার মা'র নাম হিমানী এবং বীতার বাবা অনিমেষ রায় কলেজের প্রফেসর।

শুনেই চমকে উঠেছিলেন চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত। হিমানী !!! অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের স্ত্রী !!! এই হিমানীর-ই তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার কথা চলছিল, অনিমেষ রায়ের জন্যেই তা হয় নি। হিমানীকে দেখবার অদম্য কৌতূহল জেগেছিল শঙ্কর দত্তের মনে। কৌতূহল তৃপ্ত হয়েছিল ললিতার মাধ্যমে, কিন্তু হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল অতৃপ্তি আর অনুতাপের আগুন। অমর চৌধুরীর ওপর ভীষণ চটে উঠেছিলেন শঙ্কর দত্ত; তাঁর মতে অমর চৌধুরী একটু কড়া বাপ হলে এমন মেয়ের এমন দুর্ভাগ্য হত না। জীবনে যখন বসন্ত শুরু হয় তখন মেয়েদের কি আর মাথার ঠিক থাকে? তখন তাদের মনের আকাশ তোলপাড় করে তোলে নানা রকমের রোমান্টিক পাগলামি। তখন কড়া হাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করাই বাবাদের মহান কর্তব্য, সেই মহান কর্তব্যে তাঁরা ব্যর্থ হলে, তাঁদের দুর্ভাগিনী মেয়েরা রোমান্টিক ভুলের বশে আগু-পিছু বিবেচনা না করে, অযোগ্য যার-তার গলায় মালা দিয়ে ফেলে তারপর বাকি জীবনটা হা-হুতাশ করে

মরে। শঙ্কর দত্তের নিশ্চিত ধারণা, ঠিক তাই করেছেন হিমানী রায়।

আশ্চর্য রূপ হিমানী রায়ের—দেখে চোখ ঝলসে যায় না, চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রতিটি অঙ্গ থেকে লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে। কী আশ্চর্য দৃষ্টি তাঁর দুটি চোখে, কী অনির্বচনীয় যাদু তাঁর হাসিতে, কী মাধুরী-ভরা অমৃত তাঁর কণ্ঠে, কী অপরূপ লীলায়িত ছন্দ তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে। অথচ বছরের পর বছর কী দুঃসহ দারিদ্র্যের জ্বালা ভুগতে হয়েছে এই অতুলনীয়াকে। যাঁকে রাণীর হালে রেখেও অন্তর তৃপ্ত হয় না, তাঁকে কী দুরবস্থার ভেতরেই না রেখেছে ঐ অপদার্থ অনিমেষ রায়, আধপেটা মাইনের প্রফেসর!

বহু দিন ধরে হিমানীর মনের বেদনা জেনে সমবেদনা জানাবার নিভৃত সুযোগ খুঁজেছেন শঙ্কর দত্ত। পান নি কখনো আর। না পেয়ে দুঃখ পেয়েছেন। দুঃখ চেপেই রেখেছেন মনে মনে। অনেক বারই দেখা হয়েছে হিমানীর সঙ্গে, কিন্তু প্রতিবারই অনিমেষের উপস্থিতিতে; সুতরাং শঙ্কর দত্তের অভিলাষ পূর্ণ হবার সুযোগ হয় নি। যা বলতে চান তা আভাসে-ইঙ্গিতেও কিছু বলা যাবে না, কারণ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্তের ধারণা, কলেজের প্রফেসরগুলো আর নানা দিক দিয়ে যতই অপদার্থ হোক-না কেন, আভাস-ইঙ্গিতগুলো ঠিক ঠিক বুঝে ফেলে। হিমানীর বেদনা জানবার আর তাঁকে সমবেদনা জানাবার একান্ত সুযোগ এই প্রথম পেলেন শঙ্কর দত্ত; সাড়ে আটটার আগে ফিরছেন না সকন্যা অনিমেষ রায়।

'তাহলে চলুন না একটু বেড়িয়ে আসা যাক—গঙ্গার ধারে, কিংবা গড়ের মাঠে ফাঁকা হাওয়ায়। গাড়ি তো আমার সঙ্গেই আছে,' বললেন শঙ্কর দত্ত।

'তাহলে—মানে?' হাসিমুখে শুধালেন হিমানী রায়।

'মানে, রীতা আর অনিমেষবাবুর তো সাড়ে আটটার আগে

ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, তাই বলছিলাম, এতক্ষণ একা-একা বাড়িতে বসে থাকবেন, তার চাইতে বরং—'

'বলা যায় না, যা খামখেয়ালী ওঁরা বাপ-বেটী দু জনই, হঠাৎ তার অনেক আগেই ফিরে আসতে পারেন। জানেন তো, প্রফেসররা যেমন আপনভোলা তেমনি খামখেয়ালী?'

শঙ্কর দত্ত ভাবলেন তাঁর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে যেতে আপত্তি ছিল না, আগ্রহই ছিল হিমানীর, শুধু হঠাৎ অনিমেষের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আছে বলেই তিনি শঙ্কর দত্তের আমন্ত্রণে রাজি হলেন না।

'তাছাড়া, একা থাকবই বা বলছেন কেন? বঙ্কিমবাবু আছেন,' বললেন হিমানী রায়।

'বঙ্কিমবাবু? কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না,' বললেন শঙ্কর দত্ত।

'এই যে,' হেসে বললেন হিমানী রায়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির কথা বলছি। চমৎকার সঙ্গী এঁরা।'

শঙ্কর দত্তের মনে হল এইবার হেসে-ওঠা তাঁর কর্তব্য। হেসে উঠলেন, হিমানীর মত আশ্চর্য মহিলার সামনে শালীনতার সীমা বজায় রেখে যতটা সম্ভব হো-হো করে হাসা যায়।

'আপনি বুঝি মডার্ন নভেল পছন্দ করেন না?' শুধালেন তারপর।

'না,' বললেন হিমানী রায়। 'আজকালকার ছাইপাঁশ লেখা আমার পছন্দ নয়। বঙ্কিমবাবুর লেখা কখনো পুরোন হয় না। ঐ যাঃ, একেবারে ভুলে গেছি! আপনাদের কফি, বা ওভালটিন. কিংবা চা—'

'কিছু না, কিছু না—মিসেস রায়!' বললেন শঙ্কর দত্ত। 'আমরা তো ও-পাট বাড়ি থেকে সেরেই বেরিয়েছি। আপনি ওসব করতে

গেলেই বরং ভয়ানক বিব্রত বোধ করব। তার চাইতে আপনার সঙ্গ আর মুখের কথা অনেক বেশি মিষ্টি।' বলে নিজেকে নিজেই মনে মনে বাহবা দিলেন শঙ্কর দত্ত। কথাটা বড় চমৎকার বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। আর ভেবে দেখলে এর মূলে রয়েছে হিমানীর আশ্চর্য যাদু, যাতে কাঠখোট্টা মানুষও কবি হয়ে ওঠে, ওঠে নি শুধু ঐ নিরেট অধ্যাপক অনিমেষ রায়, অপদার্থ মূর্খ অনিমেষ রায়।

হঠাৎ আরেকটা ভুল মনে পড়ে গেল হিমানীর। 'আশ্চর্য! কী যে আমার হয়েছে আজ!' বললেন তিনি। 'তোমাকে উজ্জ্বল একবার ওপরে ডাকছিল, ললিতা। একদম ভুলে গেছি বলতে। যাও, পায়ে চোট লেগে শুয়ে আছে ছেলেটা।'

ওপরে যাওয়া নতুন নয় ললিতার, সে চলে গেল ওপরে। হিমানী রায়ের মুখোমুখী একা পড়লেন শঙ্কর দত্ত। এতদিন যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এসেছে সেই সুযোগ। আনন্দের উত্তেজনায় আর উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন শঙ্কর দত্ত।

'মিসেস দত্ত কেমন আছেন?' প্রশ্ন করলেন হিমানী রায়।

যিনি নিজেই মিসেস দত্ত হতে পারতেন, তাঁরই মুখে এই প্রশ্ন বড় নিষ্ঠুর আর বড় করুণ শোনাল শঙ্কর দত্তের কানে। 'সেই একই রকম,' বললেন শঙ্কর দত্ত। 'জোয়ারও নেই, ভাঁটাও নেই।'

'বড় চমৎকার মানুষ আপনার স্ত্রী। অথচ কী নিদারুণ দুঃখই না তাঁকে পেতে হল! উঃ মাগো! আমি হলে তো পাগল হয়ে যেতুম। তবু ওঁর মুখে হাসি মিলিয়ে যায় নি।'

হাসি? হ্যাঁ, হাসিই বটে, ভাবলেন শঙ্কর দত্ত। মৃতের মুখের হাসির মত—আনন্দহীন, বেদনাহীন, অর্থহীন।

কিন্তু না, আর কালক্ষেপ নয়। খামখেয়ালী প্রফেসর ম্যাজিক না দেখেই হঠাৎ ফিরেও এসে পড়তে পারেন। শঙ্কর দত্ত বললেন, 'দেখুন, "মিসেস রায়" বলাটা বড্ড বিলেতি কায়দা বলে মনে হয়,

হলেমই-বা বিলেত-ফেরত। তার বদলে "হিমানী দেবী" বললে কি আপনি রাগ করবেন?'

'খুশি হব।'

'আমাকেও আপনি—কিছু যদি মনে না করেন—মিস্টার দত্ত না বলে শঙ্করবাবু বলতে পারেন। বললে আমি খুশি হব। স্যরি, খুশি বলাটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, বাধিত হব, কৃতার্থ হব।'

'আচ্ছা, শঙ্করবাবুই বলব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক দিন ধরেই একটা কথা বলব, একটা প্রশ্ন করব ভেবেছি, হিমানী দেবী। কিন্তু সুযোগ পাই নি, ভরসা পাই নি। আজ—'

'পেয়েছেন?'

'পাওয়াটা নির্ভর করছে আপনারই দেওয়ার ওপর।'

'বলুন আপনার প্রশ্নটা, শুনি,' বললেন হিমানী রায়।

'আপনি কি জীবনে সুখী হয়েছেন?'

শঙ্কর দত্তের আচম্‌কা প্রশ্নে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন হিমানী রায়।

'আপনি কি আমার প্রশ্নে রাগ করলেন, হিমানী দেবী?' বললেন শঙ্কর দত্ত। 'তাহলে আমি লজ্জিত, দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী।'

হিমানী রায় বললেন, 'না, রাগ আমি করি নি, শঙ্করবাবু। কিন্তু আপনার মুখে এ প্রশ্ন কেন?'

'আপনি সুখী হতে পারেন নি, আমার মনে এমনি একটা সন্দেহ জেগেছে বলে।' অকপটে এই সত্য প্রকাশ করলেন শঙ্কর দত্ত।

'কিন্তু কেন জাগল অমন সন্দেহ?' হিমানীর স্নিগ্ধকণ্ঠে রূঢ়তা বা তিক্ততার আভাস মাত্র নেই।

শঙ্কর দত্ত বললেন, 'এই নিদারুণ দারিদ্র্যের ভেতর তো

আপনাকে মানায় না, হিমানী দেবী। আপনার বিবাহের কাহিনী আমি জানি। আপনার বাবাকে আমি চিনি, সম্মান করি। আমাদের কোম্পানীরও অডিটর আপনার বাবা অমর চৌধুরী। তাঁর মনোনীত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে আপনি—'

'আপনি যা জেনেছেন তা নির্ভুল নয়, শঙ্করবাবু। বাবার মনোনীত পাত্র কে, তা আমি আজও জানি না, সুতরাং প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন ওঠে না।'

'আমার বলার ভঙ্গিটা হয়তো একটু ভুল হয়েছে,' বললেন শঙ্কর দত্ত। 'আপনার বাবা তাঁর মনোনীত পাত্রে আপনাকে সম্প্রদান করতে না পারার ফলে আপনার স্বেচ্ছাবিবাহে তিনি বাধা না দিলেও, তারপর থেকে আপনার সঙ্গে আর কোনো রকম যোগাযোগ তিনি রাখেন নি। আপনিও দারিদ্র্যের দুঃখ সয়েও তবু মানের দায়েই জেদ করে—'

'বাবার সাহায্য বা অনুকম্পা ভিক্ষা করি নি। তার প্রয়োজন হয় নি, শঙ্করবাবু। তাছাড়া আপনি হিন্দু, নিশ্চয় জানেন বিয়েব পর হিন্দু মেয়ের জীবনে স্বামীর চেয়ে বড় আর কেউ নন, ভগবানও নন?'

সৌভাগ্যবান অনিমেষ রায়েব প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন শঙ্কর দত্ত।

'জানি। তেমনি স্বামীরও পবিত্র কর্তব্য স্ত্রীকে যথাসাধ্য স্বচ্ছল অবস্থায় এবং সুখে রাখা,' বললেন শঙ্কর দত্ত। 'আমাদের কোম্পানির এড়ুকেশন-অফিসারের চাকরিটা অনিমেষবাবুর জন্যে ঠিক করে ফেললাম, শুরুতেই চারশো-টাকা মাইনে, তার ওপর নানা রকমের উপ্‌রি অ্যালাউয়্যানস্‌, পূজোয় বোনাস, প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডের ব্যবস্থা; কাজও কিছু শক্ত নয়, যেমন আরাম, তেমনি সম্মান, অথচ কলেজের মাস্টারির মত দিনরাত এ বই সে বই পড়ে পড়ে চোখের মাথা খাবার দরকার নেই। বছর বছর পঁচিশ টাকা করে মাইনে বাড়ত।

তাছাড়া মালিকপক্ষের সঙ্গে আমার অসাধারণ খাতির, অনেক রকম সুবিধেই করে দিতে পারতাম। তবু কিছুতেই রাজি হলেন না অনিমেষবাবু, কম মাইনেতে পড়ে রইলেন কলেজেই। অগত্যা এডুকেশন-অফিসারের প্রাইজ-পোস্টটা আমাকে অন্য লোককেই দিয়ে দিতে হল। কিছু মনে করবেন না, এটা কি আপনার প্রতি অন্যায় করেন নি অনিমেষবাবু?'

'ছি ছি! উনি আমার প্রতি অন্যায় কখনোই করেন না, করতে পারেনও না। উনি খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন এডুকেশন-অফিসারের চাকরি নিলে তাঁর পড়াশোনাটি নষ্ট হবে, তখন কিছুতেই রাজি হলেন না। আমিই ওঁকে রাজি হতে মানা করেছিলাম, আমার সেই মানার মানই উনি রেখেছেন। এই তো আমার আনন্দ, এই তো আমার গর্ব, শঙ্করবাবু।'

শঙ্কর দত্ত বলতে লাগলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, হিমানী দেবী। আমার মনে হয়, এ শুধু আপনার নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়া। আপনি আমার একমাত্র জীবিত সন্তানের সহপাঠিনী বান্ধবীর মা, সেই কারণে, সেই সম্পর্কেই আপনার সম্বন্ধে এত ভাবছি, এত ভেবেছি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বড় একটা কারণ আছে, সে কারণ আপনি এখনো জানেন না, আমিও খুব বেশি দিন আগে নয় যে জেনেছি।'

'কী সেই বড় কারণ, শঙ্করবাবু?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে ঐ স্টুডিবেকার গাড়ি—আমার যাকিছু, সব আজ আপনারই হতে পারত হিমানী দেবী,' বললেন শঙ্কর দত্ত। 'আমার বাবার মুখে আমি শুনেছিলাম আপনার কথা। তখন যদি জানতাম—সে আপনি এই আপনি, তাহলে যা হয়ে গেছে তা আমি কিছুতেই হতে দিতাম না। আজ মনে হয়, কেন আমি আগে যথাসময়ে জানতে পারি নি? আপনার দারিদ্র্যময় পরিবেশে

যতই দেখি, ততই মনে হয় আমার সমস্ত ঐশ্বর্য ব্যর্থ হয়ে গেল।'

হাসিমুখে হিমানী রায় বললেন, 'আপনাকেই আমি না জেনে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, এ আমি আজই প্রথম জানলাম, শঙ্করবাবু। কিন্তু আগে জানলেও মত আমার বদলাত না। দারিদ্র্যের প্রতি আমার অযথা লোভ নেই, কিন্তু বাইরের ঐশ্বর্যের চাইতে অন্তরের ঐশ্বর্য আমার কাছে অনেক বেশি লোভনীয়। আপনার ঐশ্বর্যভাগিনী আপনার জীবনসঙ্গিনী, আপনার কন্যার জননী মনোরমা দেবী তাঁর প্রতি অবিচার করবেন না, শঙ্করবাবু।'

এমন সময় ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে এল ললিতা। অনেকক্ষণ তার গল্প করা হয়ে গেছে উজ্জ্বলের সঙ্গে। সে বলল, 'এইবার শীগগির চলো, বাবা। বাড়িতে আজ আমার সেই বন্ধুরা আসবে যে। চলি, মাসিমা।'

'এসো, ললিতা। বন্ধুরা আসবে, তোমাকে তো আটকে রাখা চলে না।'

'নমস্কার, হিমানী দেবী।'

'নমস্কার, শঙ্করবাবু।'

একটু পরেই চলে গেল মস্ত স্টুডিবেকার গাড়ি। আবার বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়তে বসলেন হিমানী রায়।

রাত্রি নটায় ট্যাক্সিতে ফিরলেন কন্যাকে নিয়ে অনিমেষ রায়।

'কেমন দেখলে ফুজিয়ামা আর ভানুমতীর ম্যাজিক?' শুধালেন হিমানী।

'আশ্চর্য চমৎকার, মা,' উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠল রীতা। 'এমন অবাক কাণ্ড আর দেখি নি। কিন্তু মরে গেল ফুজিয়ামা, আশ্চর্য ম্যাজিশিয়ান ফুজিয়ামা।'

'কী করে?' উদ্বিগ্নকণ্ঠে শুধালেন হিমানী।

'শেষ খেলা দেখাতে গিয়ে। বন্দুকের গুলী খেয়ে,' বললেন অনিমেষ রায়।

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

সম্পূর্ণ যাদু-প্রদর্শনীটা সংক্ষেপে বিবৃত করলেন অনিমেষ রায়, প্রথম থেকে। প্রথমার্ধে ম্যাজিক দেখালেন যাদুসম্রাজ্ঞী ভানুমতী। যেমন চমৎকার চেহারা, তেমনি আকর্ষণীয় বেশভূষা, ততোধিক আশ্চর্য তাঁর অবিশ্বাস্যরকম হাত-সাফাই। ভানুমতীর প্রথম খেলাটি বাইবেলের 'জেনেসিস' বা সৃষ্টিকাহিনীর মঞ্চযাদু-রূপ। প্রথমে ছিল সারা মহাশূন্যব্যাপী অন্ধকার। ঈশ্বর বললেন—'আলোর আবির্ভাব হক। অমনি অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে দেখা দিল আলো। তারপর ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন. একখামচা মাটি তুলে নিয়ে তাইতে ফুঁ দিয়ে প্রাণসঞ্চার করে বানালেন আদিমানব আদম। তারপর আদমকে হিপ্নোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে তার বুকের একখানা হাড় খুলে নিলেন, তাই দিয়ে বানালেন পৃথিবীর প্রথমা নারী ইভ্।

এইভাবে এগিয়ে চলল ভানুমতীর আশ্চর্য যাদুর খেলা, পৃথিবীর যাদুর ইতিহাসে অভিনব।

ভানুমতীর সর্বশেষ খেলাটা সমকালীন হুজুগোপযোগী : 'পৃথিবীর শেষ'। মঞ্চের মাঝামাঝি শূন্যে ভেসে ধীরে ধীরে ঘুরছে একটি বড় গ্লোব, অর্থাৎ ভূগোলক, তার ওপরে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা। এতবড় গোলকটা কী করে শূন্যে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থান করে ঘুরছে, সেটাই রহস্য। উঁচু সিঁড়ির সাহায্যে গ্লোবের গায়ের দরজা একটু ফাঁক করে একজন একজন করে বারো জন জলজ্যান্ত লোক ঢুকে গেল ভেতরে। ঐটুকু গ্লোবের ভেতর একজন লোকই কোনো রকমে থাকতে পারে, কিন্তু ওরই ভেতরে বারো জন একসঙ্গে থাকে কী করে ? হল্-সুদ্ধ সবাই বিস্ময়ে অবাক। তারপর ভানুমতী তিন

বার হাততালি দিতেই হঠাৎ যেন বেলুন-ফাটার মত আওয়াজ হয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বারো জন মানুষ-সুদ্ধ পুরো গ্লোবটি। একমুহূর্তে স্টেজ একেবারে ফাঁকা। অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন যাদুসম্রাজ্ঞী অতুলনীয়া ভানুমতী। "যাদুমহল"-এ বসন্তে এই তাঁর শেষ প্রদর্শনী। উল্লাস আর অভিনন্দন মুখরিত হয়ে উঠল সারা হল্‌-জোড়া করতালিতে।

মধ্য-বিরামের পর আবার যবনিকা উঠে গেল ওপরদিকে।

নেপথ্য থেকে লাউড-স্পীকারে ঘোষিত হল: 'এইবার আমাদের পুরাতন যাদুকর ভাস্বর ভাদুড়ীর পরিবেশনে যাদু দেখাবেন দি গ্রেট "ফুজিয়ামা"।'

দেখা গেল স্টেজের মাঝখানে পিছন দিকে একটি আলনা এবং একটি ড্রেসিং-টেবিল। আলনার গায়ে ঝুলান আছে একটা ঢিলেঢালা জাপানী আলখাল্লা (কিমোনো)। স্টেজে প্রবেশ করে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন সাধারণ-পোশাক-পরা ভাস্কর ভাদুড়ী। "যাদুমহল"-এর নিয়মিত দর্শকদের কাছে অপরিচিত নন যাদুকর ভাস্কর ভাদুড়ী, কয়েক বছর আগে তিনি এই নামেই যাদুর খেলা দেখিয়েছেন "যাদুমহল"-এ, নামকরা বড় বড় যাদুকরদের প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ফাউ হিসেবে। মোটেই সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, বরং দর্শকমহলের কাছে উপহাস লাভ করেছেন। তারপর দীর্ঘ দিন তিনি ছিলেন অজ্ঞাতবাসে, গা-ঢাকা দিয়ে। দীর্ঘ দিন বাদে এবারের বসন্তে 'ফুজিয়ামা'-রূপে তাঁর "যাদুমহল"-এর মঞ্চে প্রথম আবির্ভাব। প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত—আশাতীত, অভূতপূর্ব সাফল্য। ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে সেরা সেরা ম্যাজিশিয়ান এবং ম্যাজিক-বিশেষজ্ঞ এসে দেখে বলে গেছেন ফুজিয়ামা আর ভানুমতীর মত যাদুশিল্পী বর্তমান পৃথিবীতে আর দুটি নেই। ভানুমতীর আবির্ভাবও যাদুমঞ্চে এবারই প্রথম, অথচ

প্রথমেই অতুলনীয় বিস্ময়। ভানুমতীর মত ভাস্কর ভাদুড়ীও (গ্রেট 'ফুজিয়ামা') শেক্স্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজারের মত বলতে পারেন —'I came, I saw, I conquered'—অর্থাৎ 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।'

তখন হলের দোতলায় একটা বক্স-এ বসে ছিলেন অদ্বিতীয়া, অতুলনীয়া যাদুকরী ভানুমতী। তাঁর শেষ খেলা দেখান শেষ হয়ে গেছে, এবার তার দেখবার পালা। তিনি দেখছেন স্টেজে অদ্বিতীয় 'ফুজিয়ামা'র ম্যাজিক।

'সমাগত বন্ধুগণ!' বললেন ভাস্কর ভাদুড়ী। 'আমি আগে আপনাদের অনেক ম্যাজিক দেখিয়েছি, কিন্তু খুশি করতে পারি নি। তাই এবার আমি নিজের বদলে আমার জাপানী যাদুকর বন্ধু ফুজিয়ামাকে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব। তিনি আপনাদের অদ্ভুত যাদু দেখিয়ে মুগ্ধ করবেন। তিনি আমাদের ভাষা জানেন না, তাই নীরবে ম্যাজিক দেখাবেন।'

বলে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে জাপানী পোশাক পরে জাপানী সাজলেন, একটা নকল গোঁফ লাগালেন মুখে, আর কাল কাঁচের চশমা পরলেন চোখে। মাথায় পরলেন কাপড়ের টুপি। তারপর দর্শকদের দিকে ফিরে অভিবাদন জানাতেই শুরু হল হাততালি। একটু আগেকার চেনা মানুষ ভাস্কর ভাদুড়ী যেন চোখের পলকে সবার চোখের সামনে হয়ে গেলেন জাপানী যাদুকর ফুজিয়ামা! অদ্ভুত পরিবর্তন! চেনাই যায় না যে!

নিজের দুহাত খালি দেখে এ দিকে ও দিকে তাকাতে লাগলেন যাদুকর ফুজিয়ামা। নেই, নেই, কী যেন একটা নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। চট করে স্টেজের নেপথ্যে ঢুকেই একটা যাদু-লাঠি বা ম্যাজিক-ওয়াণ্ড হাতে নিয়ে স্টেজে ফিরে এলেন ফুজিয়ামা। তারপর

শুরু হল একটার পর একটা আশ্চর্য যাদুর খেলা, যার তুলনা নেই।

তারপর এল অত্যাশ্চর্য জাপানী যাদুকর ফুজিয়ামার সর্বশেষ খেলা—চীনেমাটির প্লেট দিয়ে বন্দুকের গুলী আটকান। এ খেলাটি বহুবার নিশ্চিত সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন ফুজিয়ামা। দর্শকমহল থেকে আমন্ত্রিত যে-কেউ বন্দুকে তাজা কার্তুজ পুরে ফুজিয়ামার বুক লক্ষ্য করে গুলী চালাবেন, বুকের সামনে-ধরা চীনেমাটির প্লেটে সেই গুলী ঠেকাবেন ফুজিয়ামা।

'কিন্তু আজ আর গুলী ঠেকাতে পারলেন না ফুজিয়ামা। তাঁর এই শেষ খেলা আজ সত্যিই তাঁর "শেষ খেলা" হল। এই বসন্তই হল ফুজিয়ামার শেষ বসন্ত,' বললেন অনিমেষ রায় হিমানী রায়কে।

ব্যথায় কুঞ্চিত হল হিমানী রায়ের মুখ। 'আহা বেচারা!' বললেন হিমানী। 'ভুল? দুর্ঘটনা? হত্যা?'

'আত্মহত্যা বলতে পার,' বললেন অনিমেষ রায়।

'আত্মহত্যা?' বললেন হিমানী রায়। 'কী মর্মান্তিক দুঃখ ছিল ভাস্কর ভাদুড়ীর জীবনে?'

'যে ফুজিয়ামার মৃত্যু হল, তিনি ভাস্কর ভাদুড়ী নন।'

'সেকি?'

'গুলী বুকে বিঁধে আর্তনাদ করে ফুজিয়ামা ঢলে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে স্টেজের ওপর উঠে গেলেন জনা-আটেক পুলিশের লোক। তাঁরা আগে খবর পেয়ে সশস্ত্র হয়ে হাতকড়া নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলেন কয়েক বছর আগেকার এক হত্যাকাণ্ডের ফেরারী আসামীকে পাকড়াও করতে। ফেরারী আসামী ছিলেন 'বঙ্গভারতী' নাট্যশালার জনপ্রিয় বিচিত্র চরিত্রাভিনেতা অতনু গুপ্ত। তিনি টুঁটি চেপে মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন লম্পট পিশাচ-চরিত্র মুকুন্দশঙ্কর মালাকারের। লোকটা নাকি বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছিল, আর

বেঁচে থাকলে আরো অনেকের সর্বনাশ করত। টাকার জোরে দিনকে রাত করবার ক্ষমতা রাখত নরপিশাচ মুকুন্দ মালাকার। আইন তার নাগাল পায় নি, হয়তো পাবার চেষ্টাও করে নি। লোকটার মৃত্যুতে অগুনতি লোক খুশি হয়েছিল, সমাজের একটা বিরাট উপকার হয়েছিল। অনেকে ধন্য ধন্য করেছিলেন। কিন্তু আইনের চোখ আলাদা। ধরা পড়লে নির্ঘাত ফাঁসি তাই পালাতে হয়েছিল অতনু ভঞ্জকে। তারপর এক রেল-দুর্ঘটনায় অতনু ভঞ্জের মৃত্যু হয়েছে, এই ভুল করে পুলিশ-বিভাগ অতনুর সন্ধান-চেষ্টা বন্ধ করে দেয়। অতনু ভঞ্জ ফেরার হয়ে গোপনে কার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন জানো? ভাস্কর ভাদুড়ীর বাড়িতে। ভাস্কর ছিলেন অতনুর বন্ধু।'

'তারপর?'

'কালকের ঘটনাই বলি। অতনুর খোঁজ টের পেয়ে ওঁর কোনো পুরাতন শত্রু পুলিশের লোককে খোঁজ দিয়েছিল মুকুন্দ মালাকারের ফেরারী খুনীই যাদুকর ফুজিয়ামার ছদ্মবেশে "যাদুমহল"-এ যাদুর খেলা দেখাচ্ছে, আজই "যাদুমহল"-এ তার শেষ রজনী। তাই পুলিশের লোক তৈরি হয়ে এসেছিলেন শেষ খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করতে। আহত ফুজিয়ামার গোঁফ আর অন্যান্য ছদ্মবেশ খুলে ফেলতেই দেখা গেল তিনি ভাস্কর ভাদুড়ী নন, অতনু ভঞ্জ। তিনি আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন আজ আর পালাবার পথ নেই, পুলিশ জেনে গেছে, আর ঘেরাও করে ফেলেছে তাঁকে; তাই ধরা পড়ে ফাঁসীতে মরার চাইতে এই মৃত্যুই বেছে নিয়েছিলেন। সাজঘরে ঠিক একইরকম ছদ্মবেশী আরেকটি ফুজিয়ামা পাওয়া গেল—তিনি ভাস্কর ভাদুড়ী।'

অতনু ভঞ্জের কথা ভেবে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে গেল হিমানী রায়ের। নাট্যাভিনয়ে অতনু খ্যাতিলাভ করেছিলেন বহুজনকে

আনন্দ দিয়ে, তারপর ফেবারী অবস্থায়, হয়তো ভাস্কর ভাদুড়ীর বাড়িতে গোপনে যাদু সাধনা করেই, তিনি হয়েছিলেন অসাধারণ যাদুকর ফুজিয়ামা—বাংলার, তথা ভারতের গৌরব। এই জাতের গুণী মানুষ যত বেঁচে থাকে, আব নরপশু মুকুন্দশঙ্করেরা যত কম বাঁচে তত মঙ্গল। তবু ঐ শয়তানকে সবিয়ে দিয়ে পৃথিবীর উপকার করে থাকলেও ফাঁসীতে ঝুলতে হত অতনুকে। এই নাকি আইন! আশ্চর্য, অদ্ভুত আইন!

'অতনু ভঞ্জ বেঁচে উঠবেন না তো? বেঁচে উঠলেই তো তাঁকে আইনের হুকুমে ফাঁসীতে ঝুলতে হবে,' বললেন হিমানী। 'ভগবান করুন, অতনু ভঞ্জ যেন না বাঁচেন।'

পবদিন কাগজে খবব পাওয়া গেল যাদুকব ফুজিয়ামা-ব ভূমিকায় প্রকৃত অভিনেতা অতনু ভঞ্জের মৃত্যু হয়েছে এবং এই মৃত্যুতে অদ্বিতীয়া যাদুকবী ভানুমতী এত বিচলিত হয়েছেন যে, তিনি মঞ্চযাদু থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন।

আব খবব পাওয়া গেল—ইবানে বিবাট ভূমিকম্পে চাব হাজাবেবও বেশি লোক মাবা গেছে, বিপুল ঝড় আব ঘূর্ণী বাতাসে জাপানের বহু গ্রাম বিধ্বস্ত। এই তো আসন্ন বিবাট প্রলয়ের ছোট ছোট সংস্কবণ!

কলেজে গেলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়। বাসন্তী মিত্র এল তাঁর ক্লাসে, কিন্তু এল না অশোক কাঞ্জিলাল। অশোক কোনো এক সমুদ্রতীরে গেছে, শুনেছিলেন অনিমেষ। বাসন্তীও শুনেছে সে খবর। বাসন্তী তাই বিষন্ন। শুধু সেইজন্যেই নয়। সে শুনেছে মঞ্জরী সান্যালও কলকাতায় নেই, খুব সম্ভব সেও পালিয়ে গেছে এই দমবন্ধ-করা শহর থেকে সাগরপারের খোলা হাওয়ায়।

হঠাৎ দুপুরবেলা একটা ভূমিকম্পের ধাক্কা টের পাওয়া গেল

সারা শহরে। রাজমোহিনী কলেজে চমকে উঠল ছাত্রছাত্রীরা। চমকে উঠলেন প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, অধ্যাপকবৃন্দ। আকাশও মেঘে ছেয়ে এল। নামল বৃষ্টি। কলেজ থেকে ভিজে বাড়ি ফিরলেন অনিমেষ রায়। তাঁর মনে হল এইবার ঠিক প্রলয়-আবহাওয়া শুরু হয়েছে, এরপর প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুতবেগে অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। তারপর শুরু হবে ধ্বংসলীলা।

সে রাতে বাড়িতে ঘুম হচ্ছিল না চাফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্তের। পাশের ঘরে জানালার ধারে বিছানায় ঘুমোচ্ছেন স্ত্রী মনোরমা—হায় মনোরমা! দুটি ঘরের মাঝখানেও একটা জানালা আছে, সেই জানালা দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যায় ঐ বিছানায় ঘুমোচ্ছেন মনোরমা। বাইরে ঘন দুর্যোগ।

হিমানী রায় বলেছেন বটে, তিনি দরিদ্র স্বামীকে নিয়েই সুখে আছেন, কিন্তু সে তাঁর অভিনয় মাত্র। ভাবলেন শঙ্কর দত্ত। মনোরমার এই মানসিক জড় অবস্থা দূর করবার জন্য মাথায় শক-থেরাপির কথা বলেছিলেন ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখর। তাতে মনোরমা সারতেও পারেন, তাতে প্রাণের আশঙ্কাও আছে। খুব ভাল। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে শক-থেরাপি চিকিৎসাই করাবেন তিনি। তাতে যদি প্রাণহানি ঘটে মনোরমার, তবেই তো রেহাই। কার? মনোরমার? না তাঁর? সহানুভূতির চিঠি আর তার আসবে অনেক। অনেকে এসেও সহানুভূতি জানিয়ে যাবেন। ললিতার জন্যেও দুঃখ প্রকাশ করবেন অনেকেঃ আহা, এই বয়সেই মাতৃহীনা হল বেচারা! তিনি মুখ ভার করে থাকবেন, জলও আনতে চেষ্টা করবেন চোখে, গোঁফ-দাড়ি কামাবেন না কিছুদিন। লোকে ভাববে শোকে বিহ্বল হয়ে গেছেন দত্ত-সাহেব, কেউ জানবে না এই রেহাই পেয়েছিলেন তিনি, ঠিক এই ফলটি পাবার জন্যেই নিরাপদ শরণ নিয়েছিলেন শক-থেরাপির।

বাইরে দুর্যোগ বেড়ে উঠল। ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক। ঐ বিদ্যুতের আলোয় তাঁর মনের ভেতরটা কেউ দেখে ফেলল নাকি? জেনে ফেলল কি অধ্যাপক অনিমেষ রায়। ভীরু, অপরাধী, সন্দিগ্ধ মন শঙ্কর দত্তের। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বজ্রপাত হল। মনে হল চুরমার হয়ে গেছে তাঁর সারা বাড়িটা। চীৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন 'কাঞ্জিলাল এঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশন'-এর চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্ত।

সে সময় কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন অধ্যাপক অনিমেষ রায়? তার আগে থেকেই শুরু করা যাক, সন্ধ্যাবেলা থেকে। সন্ধ্যাবেলায়ও দুর্যোগ ছিল। বাইরের ঘরে বসে ছিলেন অনিমেষ রায়। একা। মাসিমাকে আর রীতাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উজ্জ্বল। এমন সময় ছাতা মাথায় আর বর্ষাতি-কোট গায়ে দিয়ে কালোবাবু এসে হাজির—কাফে-ডি-কলেজের মালিক কালোবরণ মাইতি।

'কী খবর কালোবাবু?'

'একখানা চিঠি। আপনার নামে। লিখে রেখে গেছেন অশোক কাঞ্জিলাল মশায়। যে খবর পেলে পর এ চিঠি আপনাকে দেবার হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, পেয়েছি সেই খবর।'

'কী খবর, কালোবাবু?'

'অনেক দূরের পাড়ি ধরেছেন অশোকবাবু। সঙ্গে মঞ্জরী সান্যাল, যিনি ছিলেন মঞ্জরী চাটুজ্জে। দু জনের মৃতদেহ ডাঙায় ফিরিয়ে দিয়েছে সমুদ্র। ট্রাংক্‌-কলে খবর এসেছে অশোকবাবুর বাবার কাছে একটু আগে। লম্বা পাড়ির কথা বলেছিলেন অশোকবাবু, সে যে এই পাড়ি তা তখন সন্দেহ করতে পারি নি।"

কান্নায় ভেঙে পড়লেন কালোবাবু। মুখ-বন্ধ খাম। খামের ওপর নাম লেখা : অধ্যাপক অনিমেষ রায়।

'চলি, স্যার।'—বলে চলে গেলেন কালোবাবু। পিছু ডাকলেন না অনিমেষ রায়। খামের মুখ ছিঁড়ে বার করলেন চিঠি। পড়লেন :

'শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সমুদ্রের প্রান্ত থেকে আপনাকে এই আমাদের শেষ প্রণাম। এ প্রণাম যখন আপনার পায়ে পৌঁছবে, তখন আমরা এই জীবনের সীমানা পেরিয়ে এসেছি। জীবনের অর্থ খুঁজেছিলাম, জীবন কোনো জবাব দেয় নি। এবার সমুদ্রকে প্রশ্ন করতে চলেছি দু জনে। দেখি, সে কোনো জবাব দেয় কি-না।

প্রণামান্তে

অশোক-মঞ্জরী

পুঃ—বাসন্তীর চিঠিখানা আপনি দয়া করে নিজে বাসন্তীর হাতে দেবেন। শেষ প্রণাম।

—অশোক কাঞ্জিলাল'

খামের ভেতর আরেকটা খাম, মুখ আঠা দিয়ে জোড়া। খামের ওপরে লেখা : বাসন্তী মিত্র।

কী লিখেছে অশোক, কী লিখেছে বাসন্তী মিত্রকে? কৌতূহল, অসীম কৌতূহল জাগল অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের মনে। জাগুক। তবু ইঙ্গিতেও কোনো প্রশ্ন করবেন না বাসন্তী মিত্রকে।

চিঠিগুলো জামার পকেটেই রেখে দিলেন অনিমেষ। ভাবলেন, জানি না এত বড় দুঃসংবাদ কী করে সইবে অশোকগত-প্রাণা বাসন্তী। ভাবলেন, কাল কলেজের লাইব্রেরিতে ডেকে চুপি চুপি দেব বাসন্তীর হাতে। খবরটা হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তার আগেই জেনে যাবে বাসন্তী।

কিছু বললেন না হিমানীকে! হিমানী শুধু দেখলেন মুখ একটু বেশি রকম গম্ভীর অনিমেষের, কিন্তু দার্শনিকের গম্ভীর মুখ দেখে অভ্যস্ত হিমানী।

বাইরে দুর্যোগের রাত। রাতের আহার সারা হল। 'আজ

আর বেশি রাত্ জেগো না। শরীরটা তোমার তেমন ভাল নেই,' বললেন হিমানী।

'বেশি জাগব না, কিন্তু একটু জাগতেই হবে, হিমানী। যাও, তোমরা শুয়ে পড়,' বললেন অনিমেষ রায়।

স্বামীর নির্দেশ পালন করলেন হিমানী। শুয়ে পড়লেন ও পাশের ঘরে কন্যাকে নিয়ে। অনিমেষ রায় বাইরের ঘরে টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে একটা দর্শনের নতুন-প্রকাশিত বই খুলে ধরলেন চোখের সামনে। পড়া নয়, পড়ার ভান শুধু। নিজের কাছেই ভান, নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া।

কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দাঁড়ালেন ও ঘরের জানালার ধারে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে উঁকি দিলেন ঘরের ভেতর। বুঝলেন্ ঘুমিয়ে পড়েছে রীতা, ঘুমিয়ে পড়েছেন হিমানী।

বাইরে দুর্যোগের রাত। পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন অনিমেষ রায়। টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করে নিলেন তালা আর চাবি। ছাতা আর বর্ষাতি-কোটটা রয়েছে ও ঘরে। থাক্। দরকার নেই। বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বাসন্তী মিত্রের বাড়ির দিকে রওনা হলেন বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিঁজতেই। হঠাৎ ব্রাউনিং-এর একটি কবিতার নায়কের মত তাঁর মনে হয়েছে: 'Who knows but the world may end to-night?'—কে জানে আজ রাতেই পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবে না? হয়তো এই রাতের শেষে এ পৃথিবীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। তার আগে যেমন করে হক আজ রাতেই বাসন্তীর হাতে পৌঁছে দিতে হবে অশোক কাঞ্জিলালের চিঠি। তারপর ধ্বংস হক পৃথিবী, সে দায়িত্ব তাঁর নয়।

দুর্যোগের ঘনঘটায় রাস্তার আলোগুলোও যেন আতঙ্কে মিটমিট করছে। বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম ধারায়। সেই বৃষ্টিতে ভেজার হাত

থেকে চিঠিখানাকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অগ্রসর হলেন অনিমেষ রায়।

আশ্চর্য! এরি মধ্যে অনিমেষ রায়ের মনে পড়ে গেল উন্মাদ কবির লেখা হাল্‌কা প্রেমের একটি হাল্‌কা ডেফিনিশান ঃ

'তুমি ও আমি-র মধ্যে যেটুকু ফাঁকা
সেই ফাঁকটুকু ফাঁকি দিয়ে ভরে
সেই ফাঁকি ভুলে থাকা—
এরি নাম হল প্রেম।'

তাঁর মনে পড়ল এই উন্মাদ কবিরই লেখা আরেকটি প্রেমতত্ত্ব ঃ

'দেহ দিয়ে মোরা দেহেরে বাসি যে ভালো,
আছে তাই ভালোবাসা,
দেহ আছে তাই আছে দেহাতীত প্রেম।'

দেহাতীত প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অশোক কাঞ্জিলাল আর মঞ্জরী। যে অশোককে কোনো দিন ভালবাসতে পারেন নি, আজ অনিমেষ রায়ের মন ভরে উঠল তার প্রতি অসীম ভালবাসায়। মৃত্যুকে জয় করেছে অশোক, তার সঙ্গে সহবিজয়িনী হল মঞ্জরী; মহাকালের বুকে তাদের প্রেম অক্ষয় হয়ে রইল।

অনেক ধাক্কা দিয়ে খোলাতে হল বাসন্তীর বাড়ির দরজা। অবাক হলেন বাসন্তীর বাবা মা, অবাক হল বাসন্তী।

'এই দুর্যোগের রাতে আপনি স্যার?'

'না এসে উপায় ছিল না, বাসন্তী। এই নাও অশোকের চিঠি। চলি। হয়তো এই আমাদের শেষ বিদায়।'

বাসন্তী বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি স্যার? শেষ বিদায় বলছেন কেন?'

'পৃথিবী হয়তো আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে, বাসন্তী। চলি। নমস্কার।'

নমস্কারটা বাসন্তীর বাবা-মার উদ্দেশে। তাঁদের কোনো মানা শুনলেন না অনিমেষ রায়, প্রাণপণে ছুটলেন বাড়ির দিকে। দুর্যোগ বেড়েই চলেছে, হয়তো আজ রাতেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, যে-কোনো মুহূর্তে। মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে একবার—শুধু একবার শেষ বারের মত তিনি দেখে নিতে চান হিমানীকে, বীতাকে।

ফুরোতে যেন চায় না পথ। দুর্যোগ বেড়ে চলে হু-হু করে। বহু কষ্টে, আপাদমস্তক নিদারুণভাবে ভিজে অবশেষে বাড়ির গেটের সামনে যখন এসে পৌঁছলেন, ঠিক তখনই ভীষণ গর্জন করে একটা বজ্রপাত হল। তীরের কাছে এসে নৌকাডুবির মত নিজের বাড়ির গেটের সামনে এসে বজ্রনিনাদের আকস্মিক প্রচণ্ড ধাক্কায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন অনিমেষ রায়।

কয়েক দিন পর। প্রলয়-সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গ্রহেরা পরাজিত, ছত্রভঙ্গ হয়ে আবার ছড়িয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন হয়ে। নন্দন-ময়দানে 'পৃথিবীরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গ্রহশান্তি মহাযজ্ঞ অপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয় নি। চার দিকে জগদ্‌গুরু অগ্নিবাবার জয়জয়কার।

বজ্র আশীর্বাদরূপে এসেছে চীফ এঞ্জিনীয়ার শঙ্কর দত্তের জীবনে। সে রাতের সেই আকস্মিক বজ্রপাতের ঐশ্বরিক শক-থেরাপিতে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে শ্রীমতী মনোরমা দত্তের। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছেন, একেবারে নতুন মানুষ, অথবা আগেকার সেই প্রিয় পুরাতন মানুষটি। সফল হয়েছে ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখরের ভবিষ্যদ্বাণী। 'মিরাক্‌ল্‌'-এর দিন বিগত হয় নি, এ কথা এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন সুখী শঙ্কর দত্ত।

কিন্তু ভীষণ ভাবনা হয়েছে অধ্যাপক অনিমেষ রায়কে নিয়ে। শক্ত নিউমোনিয়ায় বাঁচবার আশা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি

দাঁড়িয়েছিল। যমে ডাক্তারে টানাটানি চলেছিল, তাতে যম পাকাপাকি হেরে গেছেন। প্রতিদিন এসেছেন শঙ্কর দত্ত, মনোরমা দত্তকেও নিয়ে মাঝে মাঝে। প্রতিদিন এসেছেন, রাতে থেকেছেন এত দিনের অভিমানভোলা অডিটর অমর চৌধুরী।

শরীরের ডাক্তারী জয়ী হয়েছে। কিন্তু এখন আসল বিপদ রয়েছে অনিমেষের মগজে, অনিমেষের মনে। শঙ্কর দত্তই উদ্যোগী হয়ে শরণ নিলেন মনের-ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখরের।

ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখর এসে দেখলেন, এখনো স্বপ্ন আর কল্পনার ঘোরে রয়েছেন অনিমেষ রায়। এ ঘোর কেটে গিয়ে পূর্ণ স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এলে যদি তিনি টের পান প্রলয়-সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে অথচ পৃথিবী ধ্বংস হয় নি, তাহলে সেই নিদারুণ আশাভঙ্গের শক লেগে—হয় তাঁর মৃত্যু হবে, না-হয় তো সারা জীবনের মত বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবেন তিনি, যা হয়তো মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনের-ডাক্তারের মুখে একথা শুনে ভয় পেয়ে হিমানী বললেন, 'তবে কি কোনো আশাই নেই, ডাক্তারবাবু?'

'নিশ্চয় আছে মা, নিশ্চয় আছে। তোমার এই বুড়ো ছেলে তো এখনো মরে নি,' বললেন ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখর। 'তুমি জানো না, মা, তোমার স্বামীর কতবড় ভক্ত আমি। ওর দার্শনিক রচনা আমি পড়েছি, ওর চিন্তাধারার সঙ্গে আমি পরিচিত। পাপে, অকল্যাণে-ভরা এই পৃথিবী ওকে চিন্তিত করে তুলেছে, ওর মনে একটা বিভীষিকা ঢুকেছে গোটা পৃথিবীটা শয়তানের কবলিত—মানুষের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য—সবকিছু। তাই সে এই পৃথিবীর ধ্বংসকামনা করে এসেছে বছরের পর বছর। তারপর এল আশ্চর্য যোগাযোগ, বহু গ্রহের অভূতপূর্ব সম্মেলন আর পৃথিবীর নানা জ্যোতির্বিদের আসন্ন পৃথিবী-ধ্বংস ঘোষণা। উল্লসিত হয়ে উঠল অনিমেষ, তার ধ্বংস-কামনার সঙ্গে আশাতীতভাবে

খাপে খাপে মিলে গেছে এই ধ্বংস-ঘোষণা। সে নিশ্চিত হল, তার এত দিনের অভিলাষ পুরবে—তার স্বপ্ন সফল হবে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে চরম জব্দ হবে পৃথিবীগ্রাসী শয়তান! তাই তো বলছি এই স্বপ্নভঙ্গের নির্মম আঘাত সইতে পারবে না অনিমেষ।'

'তাহলে এর কী বিহিত করা যাবে, ডাক্তারবাবু?'

'ওর চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। বদলে দিতে হবে ওর দৃষ্টিকোণ। সেইটেই একমাত্র আশা। সেই চেষ্টাই আমি করব। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে, কোনো আশা নেই। তোমরা সবাই একটু বাইরে যাও।'

সবাই বাইরে গেলে, অনিমেষকে সম্মোহিত করলেন তিনি, হিপ্‌নোটিক পাস দিয়ে দিয়ে। তারপর বললেন, 'আমায় চিনতে পারো অনিমেষ?'

'কে তুমি?'

'আমি পৃথিবী। যাকে তুমি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছ। কিন্তু কেন? আমার কি অপরাধে? কী অধিকার আছে তোমার, আমি মরতে চাই না, তবু আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে?'

দীর্ঘ কথোপকথন চলল এইভাবে।

সর্বশেষে ডাক্তার শৈলেন্দ্রশেখর বললেন, "পাপ, অকল্যাণ আমাকে ছেয়ে ফেলল বলে, আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাইছ। কিন্তু তোমরা পাপকে, অকল্যাণকে বাধা দিতে কতটুকু চেষ্টা করেছ? তুমি কতটুকু করেছ? ফাঁকা মাঠ পেলে শয়তান গোল করবেই, তোমরা শয়তানকে ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিচ্ছ—সে দোষ, সে দায়িত্ব তোমাদের। আমার নয়। তোমাদের একজন দার্শনিকই বলেছেন—'While the saints sit in their ivory towers, the burly sinners rule the world'—অর্থাৎ তোমরা সাধুপুরুষরা সব হাত গুটিয়ে গজদন্ত-মিনারে বসে থাক, আর সেই

ফাঁকে পাপীরাই পৃথিবী শাসন করে। তোমরা এগিয়ে এস, বাঁচাও আমাকে সেই দানবী শক্তির হাত থেকে। তোমাদের দোষে, তোমার দোষে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিও না। আমি বাঁচতে চাই,— অনিমেষ, আমায় বাঁচতে দাও! বলো—দেবে? বলো—তুমি চাও না আমার ধ্বংস।'

অনিমেষ বলল, 'আমার ভুল তুমি ভেঙে দিয়েছ, পৃথিবী। দোষ আমার, দোষ আমাদেব। তোমার ধ্বংস আমি চাই না। তুমি বাঁচো।'

'তথাস্তু। তোমাব কামনাই পূর্ণ হবে। বাঁচব আমি। বাঁচবে পৃথিবী। এই বসন্ত হবে না আমাদের শেষ বসন্ত।'

* * *

বিপদ কেটে গেছে, আর ভয় নেই। সবাই ফিরে এল ঘরে। তারপর এল দু জন নতুন আগন্তুক। এসে শুধাল, 'কেমন আছেন স্যার?'

তারা দু জন দীপঙ্কর আব বাসন্তী।

যাদু-কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.]

লেখক দেশবিদেশের যাদুবিদ্যা এবং যাদুকরদের যে সব বিচিত্র কাহিনী এবং ইতিহাস শুনিয়েছেন তা উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক।

তিনি প্রতিষ্ঠাবান কবি-ঔপন্যাসিক, ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বহু বছর ধরে যাদু-জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের বিখ্যাত যাদু-বিষয়ক মাসিক 'দি ম্যাজিশিয়ান মন্থলি' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মৌলিক যাদুক্রীড়া সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যাদু সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য এবং অসামান্য কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী নিয়ে এ ধরণের বই ভারতীয় ভাষায় এই সর্বপ্রথম।

২৬১ পৃষ্ঠায় উনিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। মনোরম বহুরঙা প্রচ্ছদপট।

দাম : ৮'০০ টাকা

শহরতলির শয়তান

বারট্রাণ্ড রাসেল

অনুবাদ : অজিত কৃষ্ণ বসু [অ কৃ ব.]

'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' এবং 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা'-র মতো গ্রন্থের লেখক আশি বছর বয়সে ছোটগল্প লিখতে বসেছেন এমন ধরনের ঘটনা বিরল। রাসেল নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার এই গল্প লেখবার প্রচেষ্টায় পাঠক-পাঠিকারা আমার চাইতে বেশি বিস্মিত হবেন বলে আমি মনে করি না। এমন কাজ করবার চিন্তাও আমার মনে এর আগে কখনো উদিত হয় নি। কিন্তু কি কারণে জানি না হঠাৎ আমার এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি লেখবার ইচ্ছা হল·· ।' তারি ফল এই সংকলন-অন্তর্ভূক্ত পাঁচটি অসাধারণ গল্প।

দাম : ৪'৫০ টাকা

বাতাসী বিবি

অজিত কৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.]

অ্যাটর্ণী নিমাই মিত্তিরের পাঁচিল-ঘেরা মস্তবাড়ির মস্ত গেট। অনেক দিন আগে—যখন এ বাড়ির নাম ছিল 'বাতাসী মঞ্জিল'—এই পথেই বেরিয়ে আসত বাতাসী বিবির জমকালো জুড়িগাড়ি, প্রাণশক্তিতে চঞ্চল দুটি বিরাট শাদা ঘোড়ায় টানা। 'বাতাসী মঞ্জিল'-এর চার দেয়াল ঘিরে ছিল কৌতূহল আর কিংবদন্তীর জোয়ার, আর চার-দেয়াল-ঘেরা রহস্যের মহারাজ্যে মহারাণী ছিল বাতাসী বিবি। সারাদেশ-জোড়া গোপন কারবারের বিরাট দল, হরেক রকমের মাল আমদানি রপ্তানির। সিধে রাস্তায় নয়, বাঁকা রাস্তায়; খোলাখুলি নয়, আড়ালে আড়ালে চুপি চুপি, এক মুলুক থেকে আর এক মুলুকে, এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চালান—প্রকাশ্য আলোয় নয়, নেপথ্যের অন্ধকারে। আলো এদের রাস্তা দেবে না বলেই এরা বেছে নিয়েছিল অন্ধকারের পথ। এই বিরাট দলের সর্বাধিনায়িকা ছিল অপরূপ রূপময়ী মোহময়ী রহস্যময়ী বাতাসী বিবি। এ উপন্যাস তারই কাহিনী।

দাম: ৪·০০ টাকা

অস্তগামী সূর্য

ওসামু দাজাই

অনুবাদ: কল্পনা রায়

যুদ্ধোত্তর জাপানের এক ক্ষয়িষ্ণু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসটির কাহিনী। পিতা মৃত ও মাতা ক্ষয়রোগগ্রস্তা। কাহিনীর বর্ণনাকারিণী তরুণী কন্যা কাজুকো স্বামি-পরিত্যক্তা। তারই মাদকজর্জরিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাওজী কালের বিবর্তনের ধারায় আপন অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে জীবনের ঘটালো পরিসমাপ্তি। এই ভ্রাতারই মাধ্যমে সূচিত হল ভ্রাতৃবন্ধু পানাসক্ত এক ঔপন্যাসিকের প্রতি কাজুকোর প্রণয়াসক্তি এবং তারই উপহারস্বরূপ তীব্র সন্তান কামনায় বিষাদময় পরিতৃপ্তি।

দাম: ৪·৫০ টাকা

চক্ষে আমার তৃষ্ণা

বাণী রায়

জন্মজন্মান্তরের তৃষিত সে আত্মা, তারই সুগভীর তৃষ্ণার কাহিনী। এই তৃষ্ণা শুধু চক্ষের নয়—অন্তরাত্মার নিবিড়তম অনুভূতি।

নারীমনের প্রেম—প্যাশনমথিত দুই জগতের মিলনক্ষেত্রের কাহিনী—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য জগৎ সূক্ষ্ম ভাবাবেগে ধরা দিয়েছে বর্ণিল ভাষাসম্পাতে। সম্পূর্ণ অভিনব এক অপূর্ব লোকের কথা—মরণশীল জীবন এখানে অমর হয়ে দাঁড়িয়েছে, গতি হয়েছে অনন্ত, আর উর্ধ্বে সহাস্য উপস্থিতি জীবনদেবতার। সাহসিকা নায়িকার দুর্বার গতি অপ্রাপনীয় প্রেমের প্রতি, তারি পাশে যূথিকার আত্মহনন, আতা ঠাকুরঝির মেয়ের অভিসারী পদক্ষেপ। অসংখ্য নাটকের নায়ক বিপ্লবী নিরঞ্জনের এক বিচিত্র চরিত্রের পাশে মামার প্রশান্ত ক্ষমাশীলতা এখানে উপস্থিত। **দাম: ৬·০০ টাকা**

মোনা লিসা

আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া

অনুবাদ: বাণী রায়

মনোহারিকা মোনা লিসা। লুভর্ মিউজিয়মের নীলাভ আলোয় বিচ্ছুরিত চিত্রখানি পৃথিবীর অনুপম সৌন্দর্য-সম্পদ। হয়তো শিল্পীর মানসপ্রতিমা, হয়তো-বা কোনো রূপসী শরীরিণীর স্ব-বর্ণ আলেখ্য; কিন্তু যুগ-যুগান্তের মানুষের বিস্ময়-বিমোহিত চোখে মোনা লিসা এক অপার্থিব মহিমা।

যে-নারী স্বপ্নসম্ভবা, প্রণয়ীজন তাকে ভালোবাসে অনুভূতির গভীরতায়, আর রূপমুগ্ধ যৌবন তাকে কামনা করে দেহের আলিঙ্গনে। কিন্তু প্রকৃত প্রেমের অমৃত স্পর্শ জীবনের উর্ধ্বে গভীরতর নিবিড়তায়। জার্মান ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া লুভর্-এর এই স্বপ্নসম্ভবাকে ফ্লোরেন্সের রক্তমাংসের নায়িকা রূপে নতুনতর ব্যঞ্জনায় মূর্ত করেছেন তাঁর 'মোনা লিসা' কাহিনীটিতে। **দাম: ২·৫০ টাকা**

শেষ গ্রীষ্ম

বরিস পাস্টেরনাক

অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ডক্টর জিভাগো' ছাড়া বরিস পাস্টেরনাক একটিমাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন, সেটি 'শেষ গ্রীষ্ম'। 'শেষ গ্রীষ্ম' তাঁর মধ্যকালের রচনা হ'লেও এক দিকে যেমন আত্মজীবনীর অজস্র উপাদানে সমৃদ্ধ, অন্য দিকে গতানুগতিকতাবর্জিত গদ্য ভাষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণ্য। 'শেষ গ্রীষ্ম' রচনাটির শক্তি ও কুশলতা এর জটিলতার মধ্যে, কিন্তু গল্প বা কাহিনীর অংশ খুবই সবল ও সাবলীল। বলা যায়, আর্ত মানবের কথা আর বেসাবেক্সানের রূপক পাস্টেরনাক-এর এই বইটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় দিক থেকেই 'শেষ গ্রীষ্ম' স্মরণীয় গ্রন্থ ॥

মূল্য ৩·০০ টাকা

এক যে ছিল রাজা

দীপক চৌধুরী

ফতুল্লা গ্রামের গজানন মুখুজ্জে ছিলেন সেকালের একজন ঝানু বিপ্লবী। তিনি সহিংস এবং অহিংস আন্দোলন করে ধরা পড়ে নির্বাসিত হলেন আন্দামানে। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হল। ফাইলের গোলমালে ছাড়া পেতে দেরী হল একবছর। গজানন, দুলাল পরিচিত জায়গায় ঘুরলেন ফিরলেন, কিন্তু সুরাহা হল না কিছুরই। আবার ওঁরা মিলিত হল আউটরাম ঘাটে। পড়ে-পাওয়া হুইস্কি খেয়ে ওঁরা স্বপ্ন দেখল তিনতলা-বাড়ী-জোড়া শোকসভা কোম্পানীর, কাজ মৃত ব্যক্তির হয়ে মিটিং করা এবং দক্ষিণানুযায়ী কাঁদা। ব্যবসা ফেঁপে উঠল। অবশ্য স্বপ্নভঙ্গে ওঁদের মনে হল 'শতাব্দীর সেপাইটার মতো বর্তমানটাও ঘুষখোর।'

দাম : ৫·০০ টাকা

অপমানিত ও লাঞ্ছিত

ডস্টয়েভস্কি

অনুবাদ : সমরেশ খাসনবিশ

সম্পাদনা—গোপাল হালদার

বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে যাঁরা অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে টলস্টয় এবং ডস্টয়েভস্কি অগ্রগণ্য। এবং এই দু'জন শ্রেষ্ঠ রুশ ঔপন্যাসিকের মধ্যে, পাশ্চাত্য সমালোচকদের বিচারে, ফিওডর ডস্টয়েভস্কিই সর্বাগ্রগণ্য। 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের আকর্ষণকেন্দ্রে আছে অনেকগুলি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তরঙ্গায়িত ত্রিস্রোত প্রেমের কাহিনী যা জীবনের ধূসর মরীচিকাকে ধুয়ে মুছে সার্থকতার সংগমে পৌছে দিল না। তবু অভিভূত হতে হয় উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলির আরক্ত অন্তস্থলের দিকে তাকিয়ে। ডস্টয়েভস্কির এই বইখানি পড়েই স্বয়ং টলস্টয় আবেগ ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। আর একথা না বললেও চলে যে ডস্টয়েভস্কির অনুবাদ পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

' বইখানি পড়লে বিদেশী সমাজের কাহিনী পড়ছি বলে মনে হয় না, এ যেন চিরলাঞ্ছিত ও চির-অবহেলিত দুর্বল মানুষের বাস্তব চিত্র দেখছি। এরা যেন আমাদের আশেপাশে আমাদের সমাজেই রয়েছে। বিশ্বজনীন এই যে আবেদন, এই যে অনুভূতি,—তা চিরন্তন হয়ে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে'।·· ভালবাসার ধনকেও হারায় মানুষ। দ্বিধাদ্বন্দ্বে প্রকৃত প্রেমিককে ছেড়ে দিয়ে আলেয়ার পিছনে ছুটে যায়। আর তারই প্রতীক্ষায় একজনের সমগ্র জীবন রিক্ততায় ভরে ওঠে। তবুও ত্যাগের, তবু আত্মোৎসর্গের মূল্য আছে।· বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর। প্রকাশকেরা বিদেশী বইয়ের অনুবাদে নতুন ধারার সৃষ্টি করলেন। ডস্টয়েভস্কির জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা আছে।

(যুগান্তর সাময়িকী, ২৯শে জুলাই ১৯৬২)

দাম : ৮·০০ টাকা

অন্যান্য বই

প্রবন্ধ

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২'০০
জীবন জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন ৮'০০
সংকলক ও অনুবাদক : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ— ৫'০০
সংকলক ও অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৬'০০
সুখের সন্ধানে—বারট্রাণ্ড রাসেল ৫'০০
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী
আমার ঘরের আশেপাশে—ডঃ তারকমোহন দাস ৫'০০
ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

স্মৃতিকথা

ছায়াময় অতীত—মহাদেবী বর্মা ৪'০০
অনুবাদ : মলিনা রায়

ছোটগল্প

বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩'০০
স্তেফান জোয়াইগের গল্প সংগ্রহ [প্রথম খণ্ড] ৫'০০
স্তেফান জোয়াইগের গল্প সংগ্রহ [দ্বিতীয় খণ্ড] ৫ ০০
অনুবাদ : দীপক চৌধুরী
অনেক বসন্ত দু'টি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩'৫০
শহরতলির শয়তান—বারট্রাণ্ড রাসেল ৪'৫০
অনুবাদ : অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

ভ্রমণ কাহিনী

শৈলপুরী কুমায়ুন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৫'০০

ব্যঙ্গ-কাহিনী

ইতস্ততঃ—এককলমী [পরিমল গোস্বামী] ৬'০০

নাটক

জনতার কোলাহল—গোপীনাথ নন্দী ২'৫০